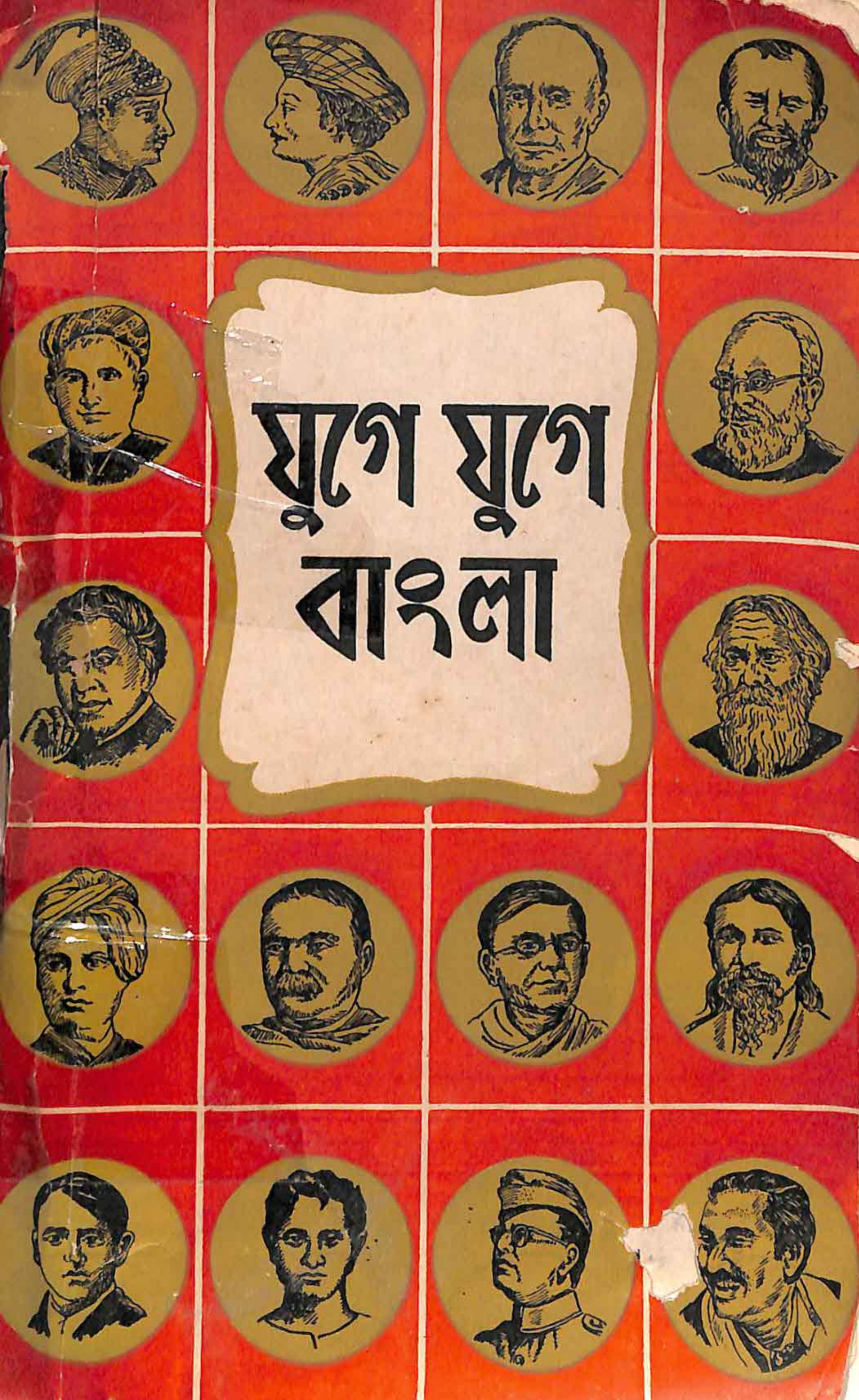
যুগে যুগে বাংলা



প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৭৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৭৪

দাম : চারি টাকা মাত্র

শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীনিশিকান্ত হাটই কর্তৃক তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ২৬ এ বিধান সরণি কলিকাতা ৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

CLASS VI

SYLLABUS OF HISTORY

History of Bengal

GEOGRAPHICAL BOUNDARIES OF BENGAL

A. (i) Bengal in ancient times (References in the Vedas and the Epics. In Jaina, Buddhist literature, from the invasion of Alexander to the rise of the Guptas 326 B.C.—320 A.D. (Bare outline)

(ii) Sasanka of Gauda (606—637 A.D.), Career, Religion extent of his kingdom.

(iii) The Palas—Election of Gopal, Dharmapala, Devapala (750 A.D—850 A.D.). Civilisation and Culture in the Pala Period (Sanskrit Literature, Buddhist Scholarship, Vernacular literature, Charyyapada & Vaishanava Poems, Universities—Uddandapura and Vikramsila, Patronization of Nalanda University ; art and architecture). Shilabhadra, Atisa or Dipankara Srijnana, Pandit Dharmapala.

(iv) Decline of Pala Power ; Kaivarta Revolt, Rampala and the revival of the Pala—his Conquest and Career.
Literature—Ramcharita of Sandhyakar Nandi, Chakrapani Dutta—(Medical Treatise).

(v) The Senas—Bijaya Sena, Ballala Sena, Lakshman Sena, Literary Works, revival of Brahmanism in Bengal. Social reforms.

B. (i) Conquest of Nadia, Capital of Lakshman Sena by Ikhtiyar Uddin Muhammad bin Bakhtiyar Khalji (1205 AD).

(ii) Rulers of Bengal : Ghiyas-ud-din Azam, Raja Ganesh, Hussain Shah, Nusrat Shah, Illyas Shah. Literary Works. Religious Toleration—Social and religious Reforms—Sri Chaitanya—Spread of Vaishnavism.

(iii) Bengal's resistance against the Mughals. Isha Khan, Kedar Roy, Pratapaditya.

C. (i) Mughal Rule in Bengal: (Outline only) Murshid Kuli Khan, Sujauddowla, Sharfaraj, Alivardi, Bargi depredations.

(ii) Advent of Europeans, Principal Trade Settlements, Conflict with the English—Plassey.

Growth of English power in Bengal—Clive, Mirzafar, Mir Kasim, Grant of Diwani, the Famine (1770), Permanent Settlement.

D. Reniassance in Bengal: Rammohan Roy, Debendranath Tagore, Iswarchandra Vidyasagar, Rajnarayan Bose, Keshab Chandra Sen, Sri Ram Krishna Deva, Bankim Chandra. (Bare outline).

E. Bengal Partition (1905): Swadeshi Movement and its leaders—Surendra Nath Tagore, Anandamohan Bose, Rabindra Nath Tagore, Aurobinda Ghosh, Bipin Chandra Pal, Deshbandhu Chittaranjan Das.

F. Revolutionaries of Bengal—With special reference to Rashbehari Bose, Bagha Jatin, M. N Roy, Khudiram, Benoy-Badal-Dinesh, Surya Sen, Chittagang Armoury Raid, Matangini Hazra, Netaji and I.N.A.

G. Regenaration of Bengal in the 20th Century: Swami Vivekananda, Sister Nevedita, Rabindranath Tagore, Asutosh Mukherjee, Jagadish Chandra Bose, Prafulla Chandra Roy, Aswini Kumar Dutta, Subhas Chandra Bose, Kazi Nazrul Islam, A.K. Fazlul Haque, Bidhan Chandra Roy.

H. Second Partition of Bengal (1947)—Boundaries of Undivided Bengal and of Partitioned Bengal (East Pakistan and West Bengal) with relevant historical background.

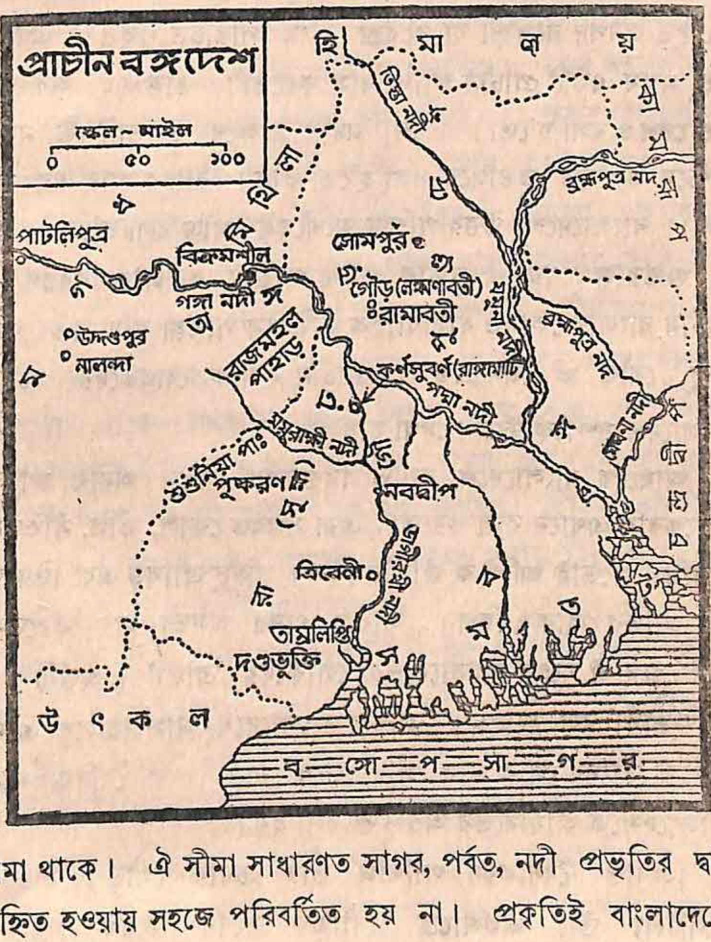
I. Rise of Bangladesh (1970-71)—Shaikh Mujibar Rahaman—Career—Awami League, India's contribution towards the Freedom Struggle of Bangladesh.

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলার ভৌগোলিক সীমা—প্রাচীনকালে বাংলা

বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশের নাম।—যে দেশের অধিকাংশ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাকেই বলে **বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশ**। বাংলা ভাষা স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে মুসলমান আমলে। তাই বাংলা নামটিও মুসলমান আমল থেকেই প্রচলিত হয়েছে।

বাংলার ভৌগোলিক সীমা।—ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে সকল দেশের আয়তন বাড়ে কমে। কিন্তু সকল দেশেরই একটি ভৌগোলিক



সীমা থাকে। ঐ সীমা সাধারণত সাগর, পর্বত, নদী প্রভৃতির দ্বারা চিহ্নিত হওয়ায় সহজে পরিবর্তিত হয় না। প্রকৃতিই বাংলাদেশের

ভৌগোলিক সীমা চিহ্নিত করে দিয়েছে। **উত্তরে**—হিমালয় পর্বতমালা (সিকিম ও ভুটান), **দক্ষিণে**—বঙ্গোপসাগর, **পশ্চিমে**—রাজমহল পাহাড় ও তৎসংলগ্ন উচ্চভূমি এবং **পূর্বে**—গারো ও লুসাই পাহাড়।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম।—প্রাচীনকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এখনকার দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গকে বলা হতো **বঙ্গ**। পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ছিল এর সীমা। এর দক্ষিণ অংশ অনেক সময় **সমতট, হরিকেল** ও **বঙ্গল** নামেও অভিহিত হ'তো। গঙ্গার পূর্বে ও পদ্মার উত্তরে অবস্থিত জনপদ **বরেন্দ্রী** বা **বরেন্দ্র** নামে পরিচিত ছিল। এখানে **পুণ্ড্র** নামে একটি প্রাচীন জাতি বাস করতো। তাই এই অঞ্চলকে **পুণ্ড্রদেশও** বলা হ'তো। গঙ্গা নদীর দক্ষিণে ও ভাগীরথী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূভাগকে বলা হ'তো **রাঢ়**। রাঢ়ের আর এক নাম **সুহ্ম**। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশকেই **গৌড়** বলা হ'তো।

গুপ্তরাজগণের অভ্যুত্থান পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার বিবরণ।—প্রাচীন বাংলার কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে ও প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনায় বাংলাদেশ সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায়।

আর্যদের বাংলাদেশে বসতি বিস্তারের আগে অনার্য জাতির লোকেরাই এখানে বাস করতো। এরা সম্ভবত কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতির মতোই **অস্ট্রিক** জাতীয় ছিল। কিছু দ্রাবিড় এবং তিব্বত-বর্মী জাতির লোকও ছিল। আর্যরা এদের অসভ্য মনে করতেন। তাই বেদে ঐ যুগের বাংলাদেশের লোকদের 'ব্রাত্য' (অশুচি) ও 'পক্ষিভাষী' বলা হয়েছে। আর্যরা বাংলাদেশে আসবার পর এদেশ সম্পর্কে তাঁদের ঘৃণার ভাব আর থাকে না। পরে বৈদিক শাস্ত্রে বাংলাদেশকে আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়।

বিখ্যাত বৈয়াকরণ **পাণিনি** তাঁর রচনায় 'গৌড়পুরীর' এবং **কৌটিল্য** তাঁর **অর্থশাস্ত্রে** 'গৌড়িক স্বর্ণের' উল্লেখ করেছেন।

মহাভারতের কাহিনী থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র বাসুদেব নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব তাঁকে বধ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির যখন যজ্ঞ করেছিলেন, তখন যজ্ঞাশ্ব রক্ষার জন্য ভীমকে তাম্রলিপ্তি ও বঙ্গের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। রামায়ণেও বাংলাদেশের অনেক প্রশংসা আছে।

সিংহলে প্রাপ্ত বৌদ্ধগ্রন্থ **মহাবংশে** রাঢ়ের রাজা **সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহের** লঙ্কাজয়ের কথা আছে। বলা হয়েছে, যে বৎসর বুদ্ধদেব মারা যান, সেই বৎসরেই বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেছিলেন।

আচারাঙ্গসূত্র নামক জৈনগ্রন্থে বলা হয়েছে, রাঢ়ের লোকেরা বর্বর ও নিষ্ঠুর ছিল। জৈনধর্মের প্রবর্তক **মহাবীরকে** তারা প্রহার করেছিল এবং তাঁর ওপর কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। জৈন সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত খারাপ খাদ্য খেয়ে এখানে বাস করতেন। কুকুর ঠেকাবার জন্য তাঁদের লম্বা লাঠি রাখতে হ'তো। তবে একথাও সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গ জৈন সন্ন্যাসীদের কর্মকেন্দ্র ছিল। তাঁদের একাধিক তীর্থঙ্কর এখানে বাস করতেন এবং রাঢ়ের সমেত-শিখরে দেহত্যাগ করেছিলেন। তীর্থঙ্কর **পার্শ্বনাথও** সমেত-শিখরেই দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারেই ঐ পাহাড়ের নাম হয়েছে **পরেশনাথ**।

প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায়, গ্রীক-বীর **আলেকজাণ্ডার** যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন বাংলাদেশে **গঙ্গরিডই** নামে এক পরাক্রান্ত জাতি বাস করতো। গ্রীকরা ভারতীয় নামগুলিকে বিকৃত ক'রেই লিখেছেন। সম্ভবত গঙ্গার তীরবর্তী রাঢ়ের অধিবাসীদেরই তাঁরা গঙ্গরিডই বলেছেন।

একজন গ্রীক লেখক লিখেছেন: "ভারতে বহু জাতির বাস। সেগুলির মধ্যে গঙ্গরিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এদের চার হাজার বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে; এজন্য অন্য কোন রাজা এ দেশ জয় করতে পারেন নি। স্বয়ং আলেকজাণ্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনে এই জাতিকে পরাস্ত করার আশা ত্যাগ করেছিলেন।"

গ্রীক লেখকরা **প্রাশিয়য়** নামে এক জাতির উল্লেখ করেছেন।

এদের রাজধানীর নাম বলেছেন পলিবোথরা বা পাটলিপুত্র। এরা গঙ্গরিডই জাতির পশ্চিমে বাস করতো। অধিকাংশ গ্রীক লেখক বলেছেন, এই দুটি জাতিই গঙ্গরিডই রাজার অধীনে ছিল এবং এই গঙ্গরিডই রাজার রাজ্য পশ্চিমে পাঞ্জাবের বিপাশা নদী থেকে পূর্ব ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানকালে পাটলিপুত্রের রাজা ছিলেন **ধন নন্দ**। তাই কেউ কেউ অনুমান করেছেন, নন্দবংশীয় রাজারা বাঙ্গালী ছিলেন।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ধন নন্দকে পরাজিত ক'রে নন্দরাজাদের রাজ্য অধিকার করেছিলেন। মৌর্যযুগে বাংলাদেশ যে মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের পর, খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেও গঙ্গরিডই জাতি যে খুবই প্রবল ছিল, তা গ্রীক-লেখক টলেমির বিবরণ ও অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক-রচিত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ায়, ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে, মগধে **গুপ্ত-রাজবংশের** প্রতিষ্ঠা হয়। গুপ্তসম্রাট **সমুদ্রগুপ্ত** যে সমগ্র বাংলাদেশ অধিকার করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবত তার বহু আগে থেকেই বাংলাদেশের উত্তরাংশ গুপ্তরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অধীন ছিল। কারণ গুপ্তরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ চীনা সন্ন্যাসীদের যে মৃগস্থাপন বিহারে আপ্যায়িত করেছিলেন, তা ছিল বরেন্দ্রে।

অনুশীলনী

১। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা লিখ। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশের নাম কি কি ছিল, বল।

২। বঙ্গ, সমতট, বঙ্গাল, রাঢ়, সুহ্ম, বরেন্দ্রী, পুণ্ড্রদেশ, গৌড়—প্রাচীনকালে বাংলাদেশের কোন্ কোন্ অঞ্চল এইসব নামে অভিহিত হ'তো?

৩। হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র থেকে প্রাচীন বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি?

৪। প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে আমরা বাংলাদেশ সম্পর্কে কি সংবাদ পাই?

৫। গঙ্গরিডই জাতি কি? এদের সম্পর্কে যা জান, লিখ।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মহারাজ শশাঙ্ক

গুপ্তযুগের পরবর্তী বাংলা।—সম্ভবত পরবর্তী গুপ্তরাজগণের অযোগ্যতা এবং বিদেশী হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কতকগুলি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। গুপ্তবংশীয় রাজারাও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট রাজ্যে রাজত্ব করছিলেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশেও কয়েকজন গুপ্তবংশীয় রাজা রাজত্ব করছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে **মহাসেনগুপ্ত** নামে একজন গুপ্তবংশীয় রাজা গৌড়ে খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। মগধও তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল এবং পূর্বদিকে তাঁর রাজ্যসীমা ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কিন্তু মহাসেনগুপ্তের বংশধররা আবার দুর্বল হয়ে পড়েন। এই সুযোগে **শশাঙ্ক** গৌড়ে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন।

শশাঙ্কের প্রথম জীবন ও রাজ্যবিস্তার।—শশাঙ্কের বংশ বা বাল্যজীবন সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন রোহিতাশ্ব বা রোটাসগড়ের গিরিরাত্রে **শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক** এই নামটি ক্ষোদিত আছে। তা থেকে মনে হয়, প্রথম জীবনে শশাঙ্ক মহাসেন-গুপ্তের অধীনেই মহাসামন্ত ছিলেন। মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর তিনি গৌড়ে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান মর্শিদাবাদ জেলায়—**কর্ণসুবর্ণে**। চিরুটি রেল স্টেশনের কাছেই সম্ভবত কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল। কারণ, কর্ণসুবর্ণের নিকটেই 'রক্তমৃত্তিকা' নামে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। ঐ অঞ্চলে রক্তমৃত্তিকা বিহার নামাঙ্কিত একটি শীলমোহর পাওয়া গেছে। ঐখানে রাঙামাটি নামে একটি গ্রামও আছে।

সমগ্র বাংলাদেশই সম্ভবত শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি মগধ, উৎকল ও কোঙ্গোদ রাজ্যও (বর্তমান গঞ্জাম জেলা) অধিকার করেছিলেন। কামরূপরাজও তাঁর হস্তে পরাজিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশ এবং বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশই যে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে **হর্ষবর্ধন** থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এর আগেই **শশাঙ্ক** তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

তৎকালীন উত্তর ভারতে কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্য।—শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত মগধের পশ্চিমেই ছিল **কান্যকুব্জ** বা **কনৌজ** রাজ্য। এখানে **মৌখরি**-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। কনৌজের পশ্চিমেই ছিল **থানেশ্বর** রাজ্য। এখানে **পুষ্যভুক্তি**-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। কনৌজের দক্ষিণে ছিল **মালব**। এখানে গুপ্তবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। আর শশাঙ্কের রাজ্যের পূর্বদিকে ছিল **কামরূপ** (আসাম)। এখানে **বর্মন্**-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন।

থানেশ্বররাজ **প্রভাকরবর্ধন** তাঁর কন্যা **রাজ্যশ্রীকে** কনৌজরাজ **গ্রহবর্মণের** সঙ্গে বিবাহ দেন। ফলে কনৌজ ও থানেশ্বরের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। কনৌজ ও থানেশ্বরের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়ায় মালবরাজ **দেবগুপ্ত** এবং শশাঙ্ক ভীত হন। তাঁরা কনৌজ ও থানেশ্বরের বিরুদ্ধে পরস্পরের সঙ্গে মিত্রতা করেন।

কনৌজ ও থানেশ্বরের বিরুদ্ধে মালব ও গৌড়ের যুদ্ধ।—এইভাবে উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্য যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল, তখন থানেশ্বরের সঙ্গে **হূণদের** যুদ্ধ বাধলো। থানেশ্বররাজ **প্রভাকরবর্ধন** হূণদের দমনের জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র **রাজ্যবর্ধনকে** পাঠালেন। রাজ্যবর্ধন জয়ী হলেন। কিন্তু হঠাৎ প্রভাকরবর্ধন মারা গেলেন। এখন রাজ্যবর্ধনই হলেন রাজা।

রাজা হয়েই রাজ্যবর্ধন সংবাদ পেলেন, মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজ শশাঙ্ক কনৌজ আক্রমণ করেছেন; দেবগুপ্তের হস্তে কনৌজরাজ গ্রহবর্মণের মৃত্যু হয়েছে এবং রাজ্যশ্রী দেবগুপ্তের হস্তে বন্দিনী হয়েছেন। রাজ্যবর্ধন অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করলেন। দেবগুপ্ত তাঁর হস্তে পরাজিত ও নিহত হলেন। কিন্তু শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হ'লো।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজের রাজা হলেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সম্পর্কে হর্ষবর্ধনের সভাকবি **হর্ষচরিত**-রচয়িতা **বাণভট্ট** লিখেছেন, শশাঙ্ক মিথ্যা বাক্যে ভুলিয়ে রাজ্যবর্ধনকে নিজ ভবনে আনেন এবং 'একাকী নিরস্ত্র' রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। হর্ষবর্ধনের সভায় বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক **হিউয়েন সাং** এসেছিলেন। তিনি তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন, শশাঙ্কের মন্ত্রীরা রাজ্যবর্ধনকে একটি সভায় আমন্ত্রণ ক'রে তাঁকে হত্যা করেন। আবার হর্ষবর্ধন তাঁর একটি শিলালিপিতে লিখেছেন, "সত্যানুরোধে রাজ্যবর্ধন শত্রুভবনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।" এসব উক্তি থেকে মনে হয়, রাজ্যবর্ধন বন্দী হয়েছিলেন এবং শশাঙ্ক বন্দী রাজ্যবর্ধনকে ক্ষমা না ক'রে হত্যা করেছিলেন।

হর্ষবর্ধন রাজা হয়ে ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে শাস্তিদানের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে একযোগে আক্রমণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু শশাঙ্কের জীবদ্দশায় তাঁরা সফল হ'তে পারেন নি। শশাঙ্কের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাং বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার কিছু পূর্বে (সম্ভবত ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ হর্ষবর্ধন ও পূর্বাংশ ভাস্করবর্মণ অধিকার করেছিলেন।

শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। হিউয়েন সাং লিখেছেন, তিনি ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন; তিনি বহু বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেছিলেন এবং বহু বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীকে হত্যা করেছিলেন; তিনি বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছিলেন এবং বুদ্ধগয়ার মন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তি অপসারিত করেছিলেন; তাই তাঁর সর্বাগ্রে দুষ্ট ক্ষত হয়েছিল, তিনি তাতেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু হিউয়েন সাংয়ের এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, তিনি নিজেই লিখেছেন, তিনি বাংলাদেশে গিয়ে বহু বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। এমন কি শশাঙ্কের রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত 'রক্তমৃত্তিকা' বিহারও অক্ষত ছিল। নিজের রাজধানীর কাছেও

বৌদ্ধবিহার যিনি ধ্বংস করেন নি, তিনি অসংখ্য বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেছিলেন, একথা বিশ্বাস করা যায় না।

অনুশীলনী

১। শশাঙ্কের পরিচয় ও রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। কনৌজ ও থানেশ্বরের সঙ্গে শশাঙ্কের বিবাদের কারণ, বিবাদ ও ফলাফলের বিবরণ দাও।

৩। শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেছিলেন এবং তিনি ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, এই অভিমত কি তুমি সমর্থন কর?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাল সাম্রাজ্য—গোপাল, ধর্মপাল ও দেবপাল

বাংলাদেশে মাৎস্য ন্যায়।—শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ এবং ভাস্করবর্মণ পূর্ব অংশ অধিকার করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পরেই হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয় এবং হর্ষের সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়ে। তিব্বতরাজ কামরূপ ও পূর্ব ভারতের কিছু অংশ অধিকার করায় গৌড়ে ভাস্করবর্মণের অধিকারও স্থায়ী হয় নি।

অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় কনৌজে **যশোবর্মন্** নামে এক রাজা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর সভাকবি **বাক্‌পতিরাজ** 'গৌড়বহো' (গৌড়বধ) নামে একটি কাব্য রচনা করেন। তা থেকে জানা যায়, যশোবর্মণের হাতে গৌড়রাজ পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু যশোবর্মণ কাশ্মীররাজ **ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের** হস্তে পরাজিত হন। ললিতাদিত্য বা তাঁর পৌত্র **জয়াপীড়ের** অধিকারও বাংলাদেশে স্থায়ী হয় নি। বাংলাদেশে বহু ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়। তাঁদের মধ্যে অবিরাম কলহ-বিবাদ চলতে থাকে।

এইভাবে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় এক শ' বছর ধরে অনৈক্য, আত্মকলহ ও বাইরের আক্রমণের ফলে বাংলায় অরাজকতা দেখা

দেয়। পুকুরের বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে, তেমনি দেশে অরাজকতা দেখা দিলে প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করতে থাকে। তাই এই অবস্থাকে বলা হয় **মাৎস্য ন্যায়ের** অবস্থা।

এই অরাজকতা ও মাৎস্য ন্যায়ের অবস্থা যখন দুঃসহ হয়ে উঠলো, তখন দেশের প্রবীণ নেতারা স্থির করলেন, তাঁরা পরস্পর বিবাদ-কলহ ভুলে একজনকে রাজা নির্বাচিত করবেন এবং সকলে স্বেচ্ছায় তাঁর প্রভুত্ব মেনে চলবেন। সত্যই, এ এক অভিনব ব্যাপার!

গোপাল।—দেশের জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। গোপালের বংশপরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 'রামচরিত' কাব্যে বলা হয়েছে বরেন্দ্রভূমি পালরাজাদের 'জনকভূ' অর্থাৎ গোপাল ছিলেন উত্তরবঙ্গের লোক। পালরাজাদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, গোপালের পিতামহের নাম **দয়িতবিষ্ণু** এবং পিতার নাম **ব্যপট**; পিতামহ দয়িতবিষ্ণু ছিলেন 'সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ' বা সকল বিদ্যায় সুপণ্ডিত; আর পিতা ব্যপট শত্রু দমন ক'রে কীর্তি স্থাপন করেছিলেন, অর্থাৎ ছিলেন বীর যোদ্ধা। রাজা হওয়ার পূর্বে গোপাল নিশ্চয় বীরত্বে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায় ও ন্যায়পরায়ণতায় অসামান্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গোপাল কবে রাজা হয়েছিলেন, তা ঠিক জানা যায় নি। তবে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও এক সময়ে হয়েছিলেন মনে হয়। তিনি প্রথমে সমগ্র বাংলাদেশের রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র বাংলাদেশ যে তাঁর পদানত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

গোপাল রাজা হয়ে বাংলাদেশে এক সুদৃঢ় রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শতবর্ষব্যাপী অরাজকতার পর দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখ-সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিল। বাংলাদেশ উত্তর ভারতে এক শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গোপাল যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা প্রায় চার শ' বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই

বংশ **পালবংশ** নামে পরিচিত। গোপাল প্রায় বিশ বছর (৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছিলেন।

ধর্মপাল।—গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্মপাল রাজা হন। তিনি রাজা হয়েই রাজ্যবিস্তারে মন দেন। সম্ভবত তিনি মগধ জয় ক'রে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ সময়ে কনৌজের সিংহাসন নিয়ে চক্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুধের মধ্যে বিবাদ চলছিল। চক্রায়ুধ ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার করায় ধর্মপাল তাঁকেই কনৌজের সিংহাসনে বসান।

মালব ও রাজপুতানায় **গুর্জর-প্রতীহার**-বংশীয় রাজারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। পশ্চিমে ধর্মপাল সাম্রাজ্য বিস্তার করায় গুর্জর-প্রতীহারদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধলো। যুদ্ধে ধর্মপাল গুর্জর-প্রতীহাররাজ বৎসরাজের হস্তে পরাজিত হলেন। কিন্তু এই পরাজয়ের ফলে তাঁর কোনও ক্ষতি হ'লো না। মালবের দক্ষিণেই ছিল **রাষ্ট্রকূট** রাজ্য। রাষ্ট্রকূটরাজ **ধ্রুব** বিন্ধ্য অতিক্রম ক'রে মালব আক্রমণ করলেন। তাঁর হস্তে গুর্জর-প্রতীহাররাজ বৎসরাজ পরাজিত হয়ে রাজপুতানায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ধর্মপালের বিরুদ্ধেও ধ্রুব অভিযান করলেন। রাষ্ট্রকূটদের প্রশস্তিতে বলা হয়েছে, ধর্মপাল পরাজিত হয়েছিলেন। ধর্মপাল পরাজিত হ'লেও তাঁর সাম্রাজ্যের কোনও ক্ষতি হয় নি। কারণ, ধ্রুব দ্রুত রাজধানীতে ফিরে যান। ধর্মপাল এক রাষ্ট্রকূট-রাজকন্যা রণ্ণাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন।

এইভাবে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে সিন্ধুনদ এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হয়েছিলেন ধর্মপাল। তিনি সম্রাটসূচক **পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ** উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অন্য উপাধি ছিল **বিক্রমশীল**। পরেও তাঁকে গুর্জর-প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি পরাজিত হ'লেও তাঁর কোনও ক্ষতি হয় নি।

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাই ধর্মপাল দেশে বহু বৌদ্ধ-বিহার স্থাপন করেছিলেন। ঐসব বৌদ্ধ-বিহারগুলিতে শিক্ষাকেন্দ্রও

ছিল। তিনি বর্তমান ভাগলপুর জেলার পাথরঘাটে একটি বিরাট বৌদ্ধবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ঐ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নাম অনুসারে **বিক্রমশীলা বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়** নামে পরিচিত হয়েছিল। তিনি উত্তরবঙ্গে **সোমপুরী** নামে একটি বিহার স্থাপন করেছিলেন। ঐ বিহারের ধ্বংসাবশেষ রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে জানা গেছে ঐটিই ছিল ভারতের বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার। তিনি বিহারের উদ্দণ্ডপুরেও (ওদন্তপুর) একটি বিশাল বিহার স্থাপন করেছিলেন।

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হ'লেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রী গর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ। গর্গের বংশধররাই পুরুষানুক্রমে পালরাজগণের মন্ত্রিত্ব করতেন।

ধর্মপাল প্রায় চল্লিশ বছর (৭৭০-৮১০ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছিলেন।

দেবপাল।—ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল রাজা হন। তিনি পাল সাম্রাজ্যকে আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন। উড়িষ্যার কতকাংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আসামও তাঁর অধীনতা স্বীকার করে। কাশ্মীরের নিকটবর্তী কম্বোজ রাজ্যও তিনি অধিকার করেন। গুর্জর-প্রতীহাররাজ **মিহিরভোজ** তাঁর হস্তে পরাজিত হন। দক্ষিণ ভারতীয় রাজাদের সঙ্গেও তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাঁর সময়েই পাল সাম্রাজ্য শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। সারা ভারতে ও ভারতের বাইরে তাঁর প্রাধান্য স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক একটি আরবী বই থেকে জানা যায়, তাঁর প্রায় ৫৮০০০ রণহস্তী ছিল। তাঁর সৈন্যবাহিনীর পোশাক ধোয়ার জন্য ১৫০০০ লোক নিযুক্ত থাকতো। তিনি অন্তত ৩৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

পালযুগে সভ্যতা-সংস্কৃতি।—প্রায় শতাব্দীকাল অরাজকতার পর পালরাজগণের সময়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল। ফলে দেশে সুখ-সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। পালরাজারা বৌদ্ধ হ'লেও তাঁরা পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। ফলে মানুষের মনে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। বৌদ্ধ, হিন্দু সকলেই প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। দেশে কেবল

বৌদ্ধ-বিহারের সঙ্গে মন্দির বিরাজ করতো না, বৌদ্ধ-বিহারের প্রাচীর-গাত্রেও হিন্দুধর্মের দেবদেবীর লীলাকাহিনী ক্ষোদিত থাকতো। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির অনুকরণে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হ'তো। মানুষের মনে উদারতা ছিল, ছিল ধন-সম্পদ্ ও অবকাশ। ফলে সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, জীবনযাত্রা সকল দিকেই অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। পালযুগ ছিল প্রকৃতই বাংলার স্বুবর্ণ যুগ।

পালযুগে বিদ্যা ও বিদ্যোৎসাহ।—পালরাজগণ সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ধর্মপাল দেশে বহু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার বিদ্যার্থীদের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল। এখানে ১১৪ জন অধ্যাপক নানা বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। পালরাজারা নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে পাণ্ডিত্যের জন্য বাংলাদেশের খ্যাতি ছিল অতুলনীয়। পালযুগের পূর্ব থেকেই বাঙ্গালী পণ্ডিতরা এই খ্যাতি অর্জন করে-ছিলেন। হর্ষবর্ধনের সময়ে অর্থাৎ শশাঙ্কের পরেই নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন **শীলভদ্র**। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা হিউয়েন সাং ভক্তির সঙ্গে স্বীকার করেছেন। হিউয়েন সাং শীলভদ্রের কাছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, নানাদেশে নানা গুরুর কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ে তাঁর যেসব সংশয় মেটেনি, শীলভদ্রের কাছে সেসব সংশয় মিটেছিল। হিউয়েন সাং লিখেছেন ঃ শীলভদ্র ছিলেন সমতটের (দক্ষিণ বাংলার) এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের সন্তান। তিনি শিক্ষালাভের জন্য সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন এবং ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় এসে উপস্থিত হন। তখন **আচার্য ধর্মপাল** ছিলেন নালন্দার কর্তা। শীলভদ্র ধর্মপালের শিষ্য হন। এই সময় দক্ষিণ ভারত থেকে এক দিগ্ বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার কাছে আচার্য ধর্মপালের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে চান। শীলভদ্র গুরুকে যেতে না দিয়ে নিজেই যান এবং তর্কযুদ্ধে পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন। রাজা শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একটি নগর দান

করতে চাইলে শীলভদ্র বললেন, আমি সন্ন্যাসী, অর্থে আমার কি প্রয়োজন? রাজার অনুনয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ দান গ্রহণ করেন এবং নগরের রাজস্ব থেকে একটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করান। তিনি পরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। সকল বিদ্যাতেই শীলভদ্র ছিলেন সুপণ্ডিত। তাই তাঁকে সকলে শ্রদ্ধাভরে 'ধর্মনিধি' নামে অভিহিত করতো।

শীলভদ্রের মতোই আর এক বাঙ্গালী পণ্ডিত ছিলেন **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান**। দক্ষিণবঙ্গের বিক্রমণিপুরে গৌড়ের এক রাজবংশে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে দীপঙ্করের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল **চন্দ্রগর্ভ**। তাঁর পিতার নাম **কল্যাণশ্রী** ও মাতার নাম **প্রভাবতী**। তিনি প্রথমে বিখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য **জেতারি** ও **রাহুলগুপ্তের** কাছে শিক্ষালাভ করেন। তারপর উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুরী বিহারে আচার্য **শীলরক্ষিতের** কাছে দীক্ষা নেন ও বৌদ্ধভিক্ষু বলে গণ্য হন। ঐ সময় থেকে তাঁর নাম হয় 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'। তারপর তিনি যবদ্বীপে গিয়ে বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য **চন্দ্রকীর্তির** কাছে বারো বৎসর শিক্ষালাভ করেন এবং সিংহলের পথে ভারতে ফিরে আসেন। পালরাজ **নয়পাল** তাঁকে বিক্রমশীল বিহারের প্রধান আচার্য-পদে নিযুক্ত করেন। তিব্বতরাজ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করার জন্য তাঁকে তিব্বতে যেতে অনুরোধ জানান। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত তিব্বতরাজের মৃত্যুকালীন অনুরোধ এড়াতে পারেন না, তিব্বতে যান এবং তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের আমূল সংস্কার করেন। তিনি সেখানে তেরো বছর থেকে প্রায় দু'শ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন। ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিব্বতে তিনি **অতীশ** (সর্বশক্তিমান্) নামে অভিহিত হতেন। এখনও তিব্বতীরা তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে।

পালযুগে সংস্কৃত সাহিত্য।—পালযুগে বাংলাদেশে সাহিত্যের ও শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা ছিল সংস্কৃত। তাই এযুগে যেভাবে বিদ্যার অনুশীলন হয়েছিল, তাতে বাংলাদেশে যে প্রচুর সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত

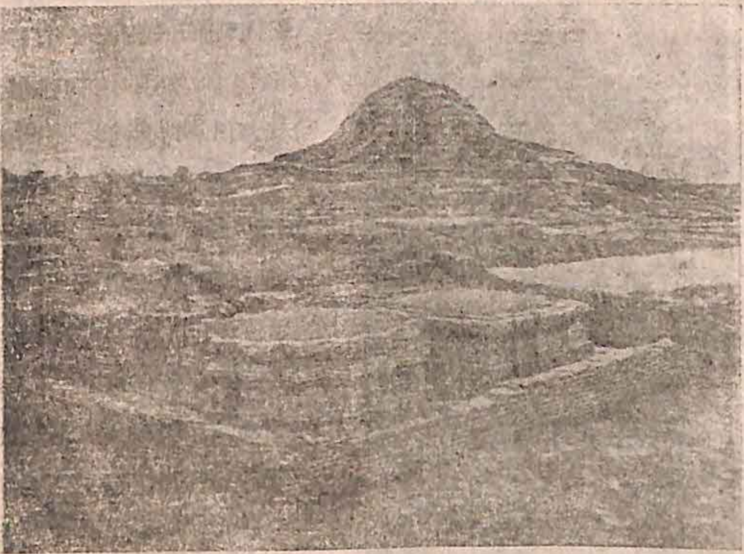
হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। আলংকারিক **ভামহ** বলেছেন, সংস্কৃতে যেসব রচনারীতি প্রচলিত আছে, সেগুলির মধ্যে **গৌড়ীই** সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পালযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের নিদর্শন সামান্যই পাওয়া গেছে। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যে বাংলার সংস্কৃত সাহিত্যের বহু উল্লেখ ও কিছু কিছু উদ্‌ধৃতি পাওয়া যায়। লিপিগুলি থেকেও বাংলার সংস্কৃত সাহিত্যের কথা জানা গেছে। পালযুগের একমাত্র কাব্য যা পাওয়া গেছে, তা সন্ধ্যাকর নন্দীর **রামচরিত**। কাব্য ছাড়াও ঐ যুগে ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে বহু পুস্তক রচিত হয়েছিল। দর্শনশাস্ত্রে **ন্যায়কন্দলী**-র রচয়িতা **শ্রীধরভট্টের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মশাস্ত্রে **ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ** নামে একখানি বই পাওয়া গেছে। বিখ্যাত 'দায়ভাগ' উত্তরাধিকার ব্যবস্থার প্রবর্তক **জীমূতবাহনের দায়ভাগ, ব্যবহারমাতৃকা** (আইনগ্রন্থ) ও **কালবিবেক** (সমাজতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ) নামে পুস্তকগুলিও পাওয়া গেছে। এই যুগে চিকিৎসাবিদ্যার অনেক পুস্তকও লেখা হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্য।—পালযুগেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূচনা হয়। বাংলাদেশে শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু লোকে **প্রাকৃত** ভাষায় (অর্ধমাগধীতে) কথা বলতো। এই অর্ধ-মাগধীর অপভ্রংশ থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আগে এই ভাষার উৎপত্তি হয়নি বলে মনে হয়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে কিছু বৌদ্ধ দোঁহা বা **চর্যাপদ** আবিষ্কার করেন। এইগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এই চর্যাপদগুলিতে চার থেকে ছটি পদ আছে। এগুলিতে সংকেতে সহজিয়া বৌদ্ধমতের কথা বলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৩ জন কবির ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গেছে। **কাহ্নপা, লুইপা** প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যগণ এইসব চর্যাপদের রচয়িতা। চর্যাপদগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ না থাকলেও এগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে খুবই মূল্যবান। চর্যাপদের ভাষার নমুনা :

"উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী। মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥" (উঁচু উঁচু পর্বত, তাহাতে শবরী বালিকা বাস করে। শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরে, গ্রীবায় গুঞ্জ মালা দেয়।)

বৈষ্ণব সাহিত্য।—পালযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে কৃষ্ণলীলা যে ঐ সময়ে অতিশয় জনপ্রিয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণলীলার বহু কাহিনী ক্ষোদিত আছে। তবে 'মানসোল্লাস' নামে একটি প্রাচীন গ্রন্থে



সোমপুরী বিহারের মন্দির—পাহাড়পুর

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক দু-একটি পদ পাওয়া গেছে। অনেকে সেগুলিকে ঐ যুগের বৈষ্ণব কবিতার নিদর্শন মনে করেন।

পালযুগে স্থাপত্য।—পাল রাজারা বহু স্তূপ, মঠ ও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ঐ সময়ে দেশে বহু সুরম্য নগর ছিল, যার কনককুম্ভখচিত অট্টালিকাগুলি 'মেরু-শিখরের মতো' শোভা পেতো।

বাংলাদেশে পাথরের একান্তই অভাব। তাই অধিকাংশ নির্মাণ-কার্যে ইঁটের ব্যবহার হ'তো। বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ু, অতিরিক্ত

বৃষ্টি ও বন্যার ফলে এইসব প্রাসাদ-মন্দির সহজেই ধ্বংস পেয়েছে। মুসলমান আক্রমণকারীরাও এইসব প্রাসাদ মন্দির ধ্বংস করেছে। এইভাবে প্রকৃতি ও মানুষ প্রাচীন বাংলার শিল্প-সম্পদকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। দু-একটি মন্দির ভগ্নপ্রায় অবস্থায় টিঁকে রয়েছে। বড় মন্দিরের অনুকরণে পাথর ও ব্রোঞ্জ দিয়ে যেসব ছোট মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল, তার দু-একটি বর্তমান আছে।

পাহাড়পুরে সোমপুরী বিহারের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকেও ঐ যুগে স্থাপত্যশিল্প কিরকম উন্নত ছিল, তা বোঝা যায়। ঐ বিহারটি ভারতের বৃহত্তম বিহার। এই বিহারের চতুষ্কোণ অঙ্গনটি প্রতি দিকে ৩০০ গজ দীর্ঘ ছিল। অঙ্গনটি উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা ছিল। আর প্রাচীরের গায়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য ১৭৭টি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। কক্ষগুলির সম্মুখ দিয়ে ছিল আট-ন ফুট চওড়া বারান্দা। অঙ্গনের মাঝখানে ছিল একটি প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরটির তলদেশ উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪ ফুট। মন্দিরটির উপরের অংশ ভেঙে পড়েছে। এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার উচ্চতা ৭০ ফুট।



পালযুগের অপূর্ব একটি শিবমূর্তি

পালযুগে ভাস্কর্য।—পালযুগে মূর্তি নির্মাণ-শিল্প বা ভাস্কর্যেরও খুবই উন্নতি হয়েছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর অসংখ্য মূর্তি এই

যুগে নির্মিত হয়েছিল। তার সামান্যমাত্রই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিছুসংখ্যক পাথর ও ধাতু দিয়ে তৈরি অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে অসংখ্য পোড়া মাটির মূর্তি। পালযুগের মূর্তিগুলি দেখলে বোঝা যায়, ঐ যুগে ভাস্কর্য কতোখানি উন্নত ছিল।

চিত্রকলা।—পালযুগে চিত্রকলারও খুবই উন্নতি হয়েছিল। দু-একটি প্রাচীন পুঁথিতে আঁকা চিত্র ছাড়া ঐ যুগের আর কোনও চিত্র পাওয়া যায় নি। রামপালের রাজত্বকালে লেখা একখানি পুঁথিতে যে কয়েকখানি ছবি আছে, সেগুলি ঐ যুগের বাংলা চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রেখাবিন্যাসে ও বর্ণ-সমাবেশে সেগুলি অতুলনীয়। তিব্বতী লামা **তারানাথ** লিখেছেন, ঐ যুগে **ধীমান** ও তাঁর ছেলে **বিৎপালো** বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা বাংলাদেশে একটি চিত্রকর সংঘ গড়ে তুলেছিলেন।

অনুশীলনী

১। গোপালের জীবন ও রাজপদে নির্বাচনের বিবরণ দাও।

২। ধর্মপালের সাম্রাজ্য বিস্তার, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও বিদ্যোৎসাহ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। কার সময়ে পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল? তাঁর সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। টীকা লিখ: (ক) পালযুগে বিদ্যা ও বিদ্যোৎসাহ; (খ) পালযুগে বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য; (গ) পালযুগে সংস্কৃত সাহিত্য; (ঘ) চর্যাপদ; (ঙ) পালযুগে স্থাপত্য; (চ) পালযুগে ভাস্কর্য ও চিত্রকলা; (ছ) শীলভদ্র; (জ) শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর; (ঝ) মাৎস্য ন্যায়।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

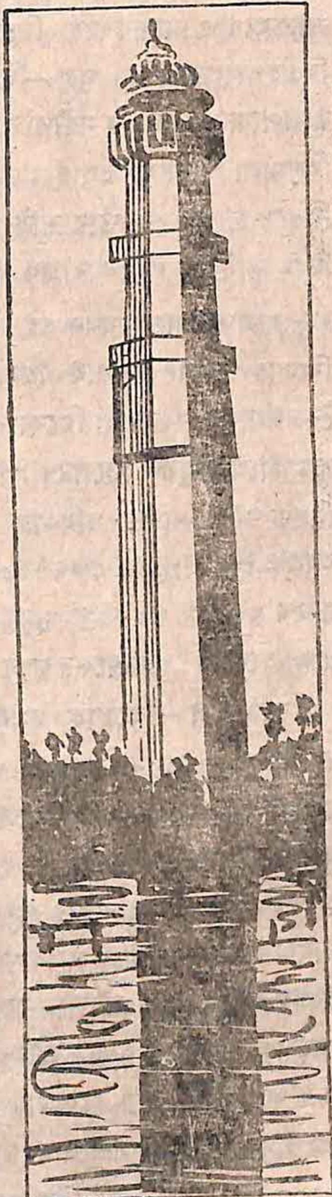
পাল শক্তির পতন—কৈবর্ত বিদ্রোহ—রামপাল

পরবর্তী পালরাজগণ।—দেবপালের মৃত্যুর পর পাল রাজারা আরও প্রায় তিন শ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই তিন শ বছরের ইতিহাসকে পালবংশের পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী বলা চলে।

দেবপালের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (মতান্তরে ধর্মপালের ভ্রাতার পৌত্র) **বিগ্রহপাল** এবং বিগ্রহপালের পর তাঁর পুত্র **নারায়ণ পাল** রাজা হন। নারায়ণ পালের সময়েই পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতীহার, দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট ও মধ্যভারতের কলচুরি রাজাদের আক্রমণের ফলে পাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। পাল সাম্রাজ্যের বেশির ভাগই, এমন কি বাংলাদেশের কিছু অংশও, পাল রাজাদের হস্তচ্যুত হয়। নারায়ণ পালের পুত্র **রাজ্যপাল** পৌত্র **দ্বিতীয় গোপাল** ও প্রপৌত্র **দ্বিতীয় বিগ্রহপাল** প্রায় ৮০ বছর রাজত্ব করেন। এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল, মধ্য ভারতের কলচুরি এবং কম্বোজ নামে এক জাতির লোকে বার বার বাংলাদেশ আক্রমণ করে। বাংলাদেশের কোন কোন অংশ তাদের পদানতও হয়। পূর্ব-দক্ষিণবঙ্গে দু-একটি স্বাধীন রাজ্যেরও উদ্ভব ঘটে।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁর পুত্র **মহীপাল** রাজা হন। তিনি পাল সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব অনেক পরিমাণে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর রাজ্য বাংলাদেশ ও বিহারের অধিকাংশ অঞ্চলেই বিস্তৃত ছিল। তিনি বারাণসীও জয় করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। প্রজাদের সুবিধার জন্য তিনি অনেক দীঘি খনন করেছিলেন। অগ্নিকাণ্ডের ফলে নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস হয়েছিল, তিনি তা পুনরায় নির্মাণ ও সংস্কারের চেষ্টা করেন। বোধগয়াতে তিনি দুটি মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি প্রাচীন কীর্তিগুলি রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁর স্মৃতি আজও বাংলাদেশের বহু দীঘি ও স্থানের নামের সঙ্গে জড়িত আছে। যেমন, মহীপাল দীঘি, মহীপাল, মহীপুর,

মহীসন্তোষ। 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' প্রবচনটিও তাঁরই স্মৃতি বহন করছে। তাঁর রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাজেন্দ্র চোলের বঙ্গ-অভিযান। ঐ সময়ে দক্ষিণ ভারতে চোলরাজগণ খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিলেন। চোলরাজ **রাজেন্দ্র চোল** নাকি তাঁর শিবপূজার জন্য ভাগীরথী থেকে গঙ্গাজল নেওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। মহীপাল রাজেন্দ্র চোলের হস্তে পরাজিত হন। তবে বাংলাদেশে চোলরাজের অধিকার স্থায়ী হয় নি। মহীপালকে সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের রাজকূট ও চালুক্য এবং মধ্য ভারতের কলচুরিদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মহীপাল প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।


কৈবর্ত স্তম্ভ

মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **নয়পাল** এবং নয়পালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **তৃতীয় বিগ্রহপাল** রাজা হন। এঁদের সঙ্গে কলচুরিদের দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলে। শেষে কলচুরিরাজ **লক্ষ্মীকর্ণ** পরাজিত হন এবং রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের সঙ্গে নিজ কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দেন। কিন্তু কলচুরিদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলার ফলে পালরাজারা হীনবল হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় মহীপাল—কৈবর্ত বিদ্রোহ।—তৃতীয় বিগ্রহপালের পর

তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় মহীপাল** রাজা হন। পাল রাজ্য বৈদেশিক আক্রমণে ও আত্মকলহে ছিন্নভিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র—**দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল** ও **রামপাল**। দ্বিতীয় মহীপাল যখন রাজা হন, তখন রাজ্যের চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র চলছিল। দুষ্ট লোকের কথায় দ্বিতীয় মহীপালের বিশ্বাস হ'লো যে, তাঁর ভাইরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। তিনি তাই তাঁদের কারারুদ্ধ করলেন।

রাজপরিবারে যখন এই রকম অন্তর্বিরোধ চলছিল, তখন রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক। বরেন্দ্রে (উত্তর বঙ্গে) কৈবর্তনায়ক **দিব্য** বা **দিব্বোক** বিদ্রোহী হলেন। তিনি উচ্চ পদে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত ও নিহত ক'রে বরেন্দ্র অধিকার করলেন। তাঁর এই বিজয়ের স্মৃতি আজও দিনাজপুরের **কৈবর্ত স্তম্ভ** বহন করছে। দিব্বোক কিছুদিন রাজত্ব করবার পর তাঁর মৃত্যু হ'লে তাঁর ভাই **রুদ্রক** বা **রুদোক** রাজা হলেন। রুদোকের মৃত্যু হ'লে রাজা হলেন **ভীম**।

রামপাল—বিদ্রোহ দমন।—দ্বিতীয় মহীপাল যখন বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, তখন শূরপাল ও রামপাল কারামুক্ত হন। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর শূরপাল রাজা হন। শূরপাল অল্পদিন রাজত্ব করেছিলেন। শূরপালের পর রাজা হন **রামপাল**। রামপাল কিছুদিন অপেক্ষা করার পর বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্যোগী হলেন। তিনি সামন্ত রাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাঁদের সাহায্য চাইলেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করলেন। এইভাবে বহুদিনের চেষ্টায় এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন। যুদ্ধে ভীম বিপুল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও দৈববিড়ম্বনায় বন্দী হলেন। রামপাল ভীমের কঠোর দণ্ড বিধান করলেন। ভীমের সম্মুখে বধ্য-ভূমিতে তাঁর পরিজনবর্গকে হত্যা ক'রে তাঁকে শরাঘাতে জর্জরিত ক'রে হত্যা করা হ'লো। রামপাল এইভাবে বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করলেন।

রামপাল রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে যত্নবান্ হন।

তিনি প্রজাদের করভার লাঘব ও কৃষির উন্নতি করেন। তিনি সম্ভবত মালদহের নিকটে তাঁর নূতন রাজধানী **রামাবতী** প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ জয় ক'রে পাল সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতেও সচেষ্ট হন। তিনি বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল জয় ক'রে কামরূপ ও উড়িষ্যা জয় করেন।

রামপাল সম্ভবত ৫৩ বছর রাজত্ব করেছিলেন। আঃ ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রাজত্বকালে পালবংশের গৌরবশিখা নির্বাণোন্মুখ দীপের মতো উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছিল। তাঁর মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই পালবংশের গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হয়।

পালরাজত্বের শেষভাগে সাহিত্য-সংস্কৃতি।—পালরাজগণের শাসনকালের শেষ যুগেও কয়েকজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান**। রাজা নয়পালই তাঁকে বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। 'দায়ভাগ'-রচয়িতা **জীমূতবাহন** ও বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত **ভবদেব ভট্ট**-ও এই সময়েই জীবিত ছিলেন। এই যুগের অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন **চক্রপাণি দত্ত**।

চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ গৌড়রাজের পাত্র এবং তাঁর রন্ধন-শালার অধ্যক্ষ ছিলেন। চক্রপাণির ভ্রাতা ভানু ছিলেন একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক। চক্রপাণি দত্ত প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের টীকা রচনা ক'রে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। তিনি 'চিকিৎসা-সংগ্রহ' ও 'আয়ুর্বেদদীপিকা' নামে প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক চরকের রচনার টীকা রচনা করেন। তিনি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক সুশ্রুতের টীকা রচনা করেন 'ভানুমতী' নামে আরএকখানি গ্রন্থে। তিনি 'শব্দচন্দ্রিকা' ও 'দ্রব্যগুণসংগ্রহ' নামেও দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পালযুগের যে একখানি মাত্র কাব্য পাওয়া গেছে, তা **সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত**। সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা প্রজাপতি নন্দী ছিলেন রামপালের 'সান্ধিবি-গ্রহিক' বা কাগজপত্রের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ কর্মচারী। সন্ধ্যাকর নন্দী

মদনপালের রাজত্বকালে রামপালের জীবন অবলম্বনে 'রামচরিত' কাব্য রচনা করেন। এতে কৈবর্ত বিদ্রোহ, বিদ্রোহ দমন ও রামপালের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে। কবি এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোক এমন সুকৌশলে রচনা করেছেন যে, পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণবিন্যাস ও শব্দযোজনা করলে এটি একদিকে রামচন্দ্র ও অন্যদিকে রামপালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'তে পারে।

পালরাজগণের বংশতালিকা

দয়িতবিষ্ণু
|
বপ্যট
|
গোপাল (আঃ ১৭৫০-১৭৭০)

- ধর্মপাল (আঃ ৭৭০-৮১০)
  - ত্রিভুবন পাল
  - দেবপাল
  - [মতান্তরে ত্রিভুবনপালই দেবপাল নামে রাজা হয়েছিলেন]
- বাক্‌পাল
  - জয়পাল
    - প্রথম বিগ্রহপাল (শূরপাল)
      - নারায়ণ পাল
        - রাজ্যপাল
          - দ্বিতীয় গোপাল
            - দ্বিতীয় বিগ্রহপাল
              - প্রথম মহীপাল
                - নয়পাল
                  - তৃতীয় বিগ্রহপাল
                    - দ্বিতীয় মহীপাল
                    - দ্বিতীয় শূরপাল
                    - রামপাল
                      - রাজ্যপাল
                      - বিত্তপাল
                      - কুমারপাল
                      - মদনপাল
                        - তৃতীয় গোপাল

অনুশীলনী

১। রাজা মহীপাল সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। রামপালের জীবন ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৪। টীকা লিখ : (ক) কৈবর্ত বিদ্রোহ ; (খ) চক্রপাণি দত্ত ; (গ) সন্ধ্যাকর নন্দী ও তাঁর 'রামচরিত'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলায় সেন-শাসন

সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা।—রামপালের মৃত্যুর পর সম্ভবত তাঁর পুত্রদের মধ্যে গৃহবিবাদ এবং সামন্তরাজগণের বিদ্রোহের ফলেই পালরাজগণ অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়।

সেনরাজগণের পূর্বপুরুষরা দাক্ষিণাত্যের **কর্ণাটদেশের** অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের শিলালিপিতে তাঁদের **ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়** বলা হয়েছে। সম্ভবত তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে যুদ্ধকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করায় তাঁরা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সেনরা প্রথম কবে বাংলাদেশে এসেছিলেন ঠিক বলা যায় নি। **বিজয়সেনের** দেওপাড়া লিপিতে বলা হয়েছে, **সামন্ত সেন** রামেশ্বর সেতুবন্ধন পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান করেছিলেন এবং কর্ণাটদেশের শত্রুদের ধ্বংস ক'রে শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে এসে বাস করেছিলেন। **বল্লাল সেনের** নৈহাটি তাম্রশাসনে বলা হয়েছে, সেনবংশীয়দের অনেকেই রাঢ়দেশের অলংকারস্বরূপ ছিলেন। তাঁদের বংশেই সামন্ত সেন জন্মেছিলেন। অনেকের মতে, সেনবংশের লোকেরা দক্ষিণ ভারতীয় রাজারা বাংলাদেশে যেসব অভিযান করেছিলেন, সেইসব অভিযানের কোনোটিতে এদেশে এসেছিলেন এবং এদেশে বসবাস করেছিলেন। অনেকে বলেন,

পালরাজাদের সৈন্যবাহিনীতে যেসব দক্ষিণ ভারতীয় নিযুক্ত ছিলেন, সেন রাজারা তাঁদেরই বংশধর।

যাই হ'ক, সামন্ত সেন এদেশে কোনও রাজ্য স্থাপন করেন নি। কারণ, তাঁর পৌত্র বিজয় সেনের লিপিতে সামন্ত সেনের নামের সঙ্গে রাজসূচক কোনও উপাধি ব্যবহার করা হয় নি। অথচ ঐ লিপিতে বিজয় সেন তাঁর পিতা হেমন্ত সেনকে মহারাজাধিরাজ ও মাতা যশোদেবীকে মহারাজ্ঞী বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, সামন্ত সেনের পুত্র **হেমন্ত সেনই** বাংলাদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

বিজয় সেন।—হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিজয় সেন রাজা হন। রামপালের মৃত্যুর পর পালরাজ্যে গোলযোগ দেখা দিলে তিনি নিজ রাজ্যকে সম্প্রসারিত করবার সুযোগ পান। তিনি শূরবংশীয় রাজকন্যা **বিলাসদেবীকে** বিবাহ করায় তাঁর শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। বিজয় সেন সমস্ত বঙ্গদেশে নিজ অধিকার বিস্তারে সচেষ্ট হলেন। তিনি বর্মবংশীয় রাজাকে পরাজিত ক'রে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করলেন। তিনি পালরাজ মদনপালকে পরাজিত ক'রে বাংলাদেশের পালরাজ্যের অধিকাংশও অধিকার করলেন। এইভাবে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ তাঁর অধিকারভুক্ত হ'ল। তিনি কামরূপরাজ, উড়িষ্যারাজ এবং মিথিলার কর্ণাটদেশীয় রাজা নান্যদেবকেও পরাজিত করলেন। এইভাবে বিজয় সেন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করলেন।

সেন রাজারা হিন্দু ছিলেন। সেনবংশের প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে আবার হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান ঘটলো। আনুমানিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেনের মৃত্যু হয়।

বল্লাল সেন।—বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন রাজা হলেন। বল্লাল সেন বীর ও বিদ্বান ছিলেন। তাঁর রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' থেকে জানা যায়, তিনি অনিরুদ্ধ নামে এক পণ্ডিতের কাছে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তিনি যৌবনে পিতার যুদ্ধাভিযানগুলিতে অংশগ্রহণ করেন এবং কোন কোনটিতে সৈনাপত্যও করেন। পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি সম্ভবত

মিথিলা (উত্তর বিহার) জয় করেছিলেন। মগধে পালবংশীয় রাজা গোবিন্দ পাল রাজত্ব করতেন। রাজা হওয়ার পর বল্লাল সেন তাঁকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন। সুতরাং বল্লাল সেন তাঁর পিতৃরাজ্যকে কেবল অক্ষুণ্ণ রাখেন নি, তাকে তিনি বর্ধিতও করেছিলেন। তিনি চালুক্য রাজকন্যা রামদেবীকে বিবাহ করেন।

বল্লাল সেন কেবল বীর ও সুশাসক ছিলেন না, তিনি বিদ্বান ও কবি ছিলেন। তিনি **দানসাগর, অদ্ভুতসাগর** প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'দানসাগরে' তিনি দানই ইহজগতে শ্রেষ্ঠ কর্ম ব'লে প্রচার করেন, **অদ্ভুতসাগরে** জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বল্লাল সেন তাঁর পিতার মতোই শিবের উপাসক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। নিজে হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়ায় তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্মত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ও শাস্ত্রবিহিত কর্মে লিপ্ত থাকতেন। তিনি হিন্দু সমাজের সংস্কার-সাধনের জন্য **কৌলিন্য-প্রথার** প্রবর্তন করেন।

তিনি কিছু-কম বাইশ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হাতে রাজ্যভার দিয়ে ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গা-তীরে গিয়ে বাস করতে থাকেন। সম্ভবত তিনি সস্ত্রীক গঙ্গাগর্ভে সেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন।—১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রৌঢ় বয়সেই লক্ষ্মণ সেন পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি পিতামহ ও পিতার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত গোবিন্দ পালের বিরুদ্ধে পিতা বল্লাল সেনের যুদ্ধে এবং উড়িষ্যা ও আসামের বিরুদ্ধে পিতামহ বিজয় সেনের যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি গৌড়কে সম্পূর্ণরূপে তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি গৌড় জয় ক'রে গৌড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এই নূতন রাজধানীর নাম হয় **লক্ষ্মণাবতী**। তাঁর পুত্রদের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে, তিনি পুরীতে, কাশীতে ও প্রয়াগে

'সমরজয়স্তম্ভ' স্থাপন করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁর পিতামহ ও পিতার রাজ্যকে কেবল অক্ষুণ্ণ রাখেন নি, তাকে বর্ধিতও করেছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন কেবল বীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি পিতার নির্দেশে পিতার অসমাপ্ত অদ্ভুতসাগরের রচনা শেষ করেছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গেছে। **ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতি** ধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিরা তাঁর সভা অলংকৃত করতেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি **হলায়ুদ** ছিলেন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত।

লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ ও পিতা শিবের উপাসক ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। তিনি 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি ব্যবহার করতেন। সমস্ত জীবন যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনে ব্যয় ক'রে তিনি শেষ বয়সে সম্ভবত ধর্ম-চিন্তাতেই মগ্ন থাকতেন। এইজন্য তিনি রাজধানী লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করে গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে এসে বাস করেছিলেন। তিনি সম্ভবত এই সময়ে রাষ্ট্র-পরিচালনায় যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনাও হয়েছিল। সুন্দরবনের খাড়ি পরগনায় **ডোম্মন** পাল নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ ক'রে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এর চেয়েও ভয়ংকর বিপদ দেখা দেয় শীঘ্রই। মুসলমানরা ভারত আক্রমণ করে।

মুসলমান আক্রমণকারী মহম্মদ ঘুরী ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী ও আজমীর জয় করেন। পর বৎসর তিনি কনৌজ অধিকার করলে তাঁর অধিকার মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণ সেন রাজ্য রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন নি। এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজাকে তাঁর মন্ত্রী ও অমাত্যরাও কেউ সতর্ক করেন নি। ফলে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে ইক্তিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খলজি নামে এক তুর্কী সেনাপতি নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন অরক্ষিত পুরী ত্যাগ ক'রে তাঁর রাজ্যের পূর্ব অংশে চলে যান। এর পরও তিনি কয়েক বছর রাজত্ব করেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন পর পর রাজা হন। সেন বংশ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজ্যের আয়তনও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়। সম্ভবত সেন বংশের শেষ রাজা ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

সেনযুগে সাহিত্য।—সেনযুগে সাহিত্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল। তখনও সংস্কৃতই ছিল সাহিত্যের ভাষা। এই যুগে বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটায় সংস্কৃত চর্চা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের জন্য বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সেজন্য বল্লাল সেন নিজে রচনা করেছিলেন 'ব্রতসাগর', 'আচারসাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে পাঁচখানি গ্রন্থ। শেষের দুখানি মাত্র পাওয়া গেছে। হলায়ুধ ছিলেন সে-যুগের ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঐ যুগে বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান অমরকোষের টীকাও রচিত হয়েছিল।

এ যুগে অসংখ্য সংস্কৃত কবিতা ও কাব্য রচিত হয়েছিল। সেন রাজারা প্রায় সকলেই সুকবি ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের সভায় জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন, শরণ প্রভৃতি কবিরা উপস্থিত ছিলেন। **জয়দেব** ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তাঁর **গীতগোবিন্দম্** কাব্য সারা ভারতে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জয়দেব বীরভূম জেলার অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী ও স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। জয়দেব সঙ্গীতেও সুনিপুণ ছিলেন। গীতগোবিন্দের মতো সুমধুর ভাষায় লিখিত সুরলহরীপূর্ণ কাব্য যে-কোনও ভাষায় বিরল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব কবিতার যে বন্যা এসেছিল, গীতগোবিন্দকে তার উৎস বলা চলে।

কবি **ধোয়ী** মেঘদূতের অনুকরণে তাঁর **পবনদূত** কাব্য রচনা করেছিলেন। ধোয়ী সম্ভবত আরও কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি পাওয়া যায় নি। জয়দেব ধোয়ীকে 'কবিক্ষ্মাপতি' বা কবিগণের রাজা আখ্যা দিয়েছেন। তিনি কবি **উমাপতি ধরকে**

বাক্যবিন্যাসে পটু, **গোবর্ধনকে** প্রেমের কবিতা লেখায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং **শরণকে** দুরূহ রচনায় দ্রুত ও সিদ্ধহস্ত ব'লে বর্ণনা করেছেন। গোবর্ধনের **আর্যা সপ্তশতী** সারা ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান—সমাজ সংস্কার।—সেন রাজারা কেবল হিন্দুই ছিলেন না, তাঁরা হিন্দুশাস্ত্রবিহিত যাগযজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মনিষ্ঠার বিষয়েও অত্যুৎসাহী ছিলেন। পালযুগে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক মতের প্রভাবে হিন্দুধর্মে শৈথিল্য এসেছিল। তাই হিন্দু-ধর্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য বল্লাল সেন **কৌলীন্যপ্রথার** প্রবর্তন করেছিলেন। সমাজের গঠনে কুল বা পরিবারের ভূমিকাই প্রধান। তাই বল্লাল সেন বিদ্যা, বিনয়, আচার প্রভৃতি নয়টি শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী পরিবারগুলিকে **কুলীন** আখ্যা দেন। হিন্দুধর্মের উচ্চবর্ণের লোকেরাই কুলীন হওয়ার বা কৌলীন্য লাভের অধিকারী হয়। বল্লাল সেন নয়টি গুণের ভিত্তিতেই কৌলীন্য দান করেছিলেন। যে ব্যক্তি এই নয়টি গুণের অধিকারী হবে, সে-ই হবে কুলীন এবং নয়টি গুণের অধিকারী না হ'লে কুলীনও তার কৌলীন্য হারাবে—বল্লাল সেন এই ব্যবস্থাই করেছিলেন। তিনি প্রতি ছত্রিশ বছর অন্তর কৌলীন্য বিচারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা পরে কার্যকর হয় নি। ফলে কৌলীন্য বংশগত হয়ে পড়ে এবং নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও কুলীন ব'লে পরিচিত হয়।

হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ণভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কৌলীন্যপ্রথার ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হ'ল। এখন কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ঘৃণার চক্ষে দেখল না, কুলীনরাও অকুলীনদের ঘৃণার চক্ষে দেখতে লাগলো। এর ফল হ'ল বিষময়। মুসলমান আক্রমণের কালে হিন্দুসমাজের একাংশ সহজেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করলো।

অনুশীলনী

১। সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। বল্লাল সেনের জীবন ও কৃতিত্ব বিচার কর।

৩। লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। সেন যুগের সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। টীকা লিখ : (ক) কৌলীন্যপ্রথা ; (খ) জয়দেব।

কালরেখা

আঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০০ অব্দ—	বেদের রচনাকাল
আঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ অব্দ—	মহাবীর ও বুদ্ধ
খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দ—	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ
আঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দ—	মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
৩২০ খ্রীষ্টাব্দ—	গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ—	রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ও হর্ষবর্ধনের রাজ্যলাভ
আঃ ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ—	শশাঙ্কের মৃত্যু
আঃ ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ—	হর্ষবর্ধন কর্তৃক মগধ ও ভাস্করবর্মণ কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার
আঃ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ—	গোপালের রাজা নির্বাচন
আঃ ৭৭০ „ —	ধর্মপালের রাজ্যলাভ
আঃ ৮১০ „ —	দেবপালের রাজ্যলাভ
আঃ ১১৩০ „ —	রামপালের মৃত্যু ও পাল যুগের অবসান
আঃ ১১২৫ „ —	বিজয় সেনের রাজ্যলাভ
আঃ ১১৫৮ „ —	বল্লাল সেনের রাজ্যলাভ
আঃ ১১৭৯ „ —	লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যলাভ
আঃ ১২০২ „ —	বক্তিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণ
আঃ ১১০৫ „ —	লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বক্তিয়ার খলজির নদীয়া-জয়

মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান।—বল্লাল সেন যখন বাংলাদেশে রাজত্ব করছিলেন, তখন ভারতের পশ্চিমে আফগানিস্থানে **ঘুর** নামে একটি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন **তুর্কী**-জাতীয় মুসলমান। নাম **গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ**। গিয়াসুদ্দিন মহম্মদের ভাই **শিহাবুদ্দিন মহম্মদই** ভারতের ইতিহাসে **মহম্মদ ঘুরী** নামে পরিচিত। মহম্মদ ঘুরীর হস্তে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী ও আজমীরের রাজা **চৌহান**-বংশীয় **তৃতীয় পৃথ্বীরাজ** তরাইন বা তিরৌরির যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লী ও আজমীর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মুসলমান অধিকারে যায়। পর বৎসর মহম্মদ ঘুরী আবার ভারত আক্রমণ করেন এবং কনৌজের গাহড়বাল-বংশীয় রাজা **জয়চন্দ্রকে** পরাজিত করেন। এইভাবে মহম্মদ ঘুরীর রাজ্যসীমা মগধের কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ইক্তিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খলজি।—অর্থাৎ বক্তিয়ার খলজির পুত্র ইক্তিয়ারউদ্দিন মহম্মদ। কিন্তু তিনি পিতার নামেই—বক্তিয়ার খলজি নামেই—বাংলার ইতিহাসে পরিচিত হয়েছেন। ইক্তিয়ারউদ্দিন জাতিতে ছিলেন তুর্কী। তিনি ঘরমশির অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য বহু তুর্কী যুবকের মতোই ঘুর বাহিনীতে যোগ দিতে আসেন। তিনি বলিষ্ঠ ও সাহসী হ'লেও ছিলেন বেঁটে ও কদাকার। তাই সৈন্যদলে স্থান পান নি, সামান্য একটি চাকরি পান। কিন্তু সামান্য চাকরিতে সন্তুষ্ট থাকার মানুষ ছিলেন না তিনি। তিনি ঘুর বাহিনীর সঙ্গে ভারতে চলে আসেন। ঐ সময় তিনি এতোই দরিদ্র ছিলেন যে, তাঁর একখানি তলোয়ার ও একটি ঘোড়া কেনারও সামর্থ্য ছিল না। উত্তর ভারতে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হ'লে তাঁর এক আত্মীয় বদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনিই ইক্তিয়ারউদ্দিনকে দয়াপরবশ হয়ে কয়েকখানি গ্রাম দেন।

ইক্তিয়ারউদ্দিন তখন কিছু অর্থ সঞ্চয় ক'রে ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র কেনেন এবং একটি দল গড়ে তোলেন। ঐ দল পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে লুণ্ঠন চালাতে থাকে। ক্রমেই ইক্তিয়ারউদ্দিনের দলে বহু লোক এসে যোগ দেয় এবং দলটি সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয়।

নদীয়া-বিজয়।—ইক্তিয়ারউদ্দিন উৎসাহিত হয়ে মগধ জয় ক'রে নালন্দা বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন। তারপর অতর্কিতে বাংলাদেশে প্রবেশ ক'রে নদীয়া আক্রমণ করেন। তিনি নদীয়ায় ব্যাপক লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালান। রাজা লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ছেড়ে পূর্ববঙ্গে চলে যান। এই ঘটনা ১২০২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল মনে হয়।

প্রায় সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক **মিনহাজউদ্দিন** লিখেছেন, ইক্তিয়ারউদ্দিন মাত্র ১৭ জন তুর্কী অশ্বারোহী নিয়ে নদীয়া জয় করেছিলেন। এই কাহিনী অত্যন্ত অতিরঞ্জিত মনে হয়। তবে ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই ইক্তিয়ারউদ্দিন নদীয়া আক্রমণ ক'রে থাকবেন। তিনি ঐ সময়ে নদীয়া আক্রমণ করলেও নদীয়া জয় করেছিলেন ব'লে মনে হয় না। কারণ, ঐ ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে মুঘিসউদ্দিন ইয়াজবক নদীয়া জয় করেছিলেন এবং নদীয়া জয়ের স্মারক মুদ্রা চালু করেছিলেন। তবে ইক্তিয়ারউদ্দিন যে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী অধিকার ক'রে বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের সূচনা করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

অনুশীলনী

১। ইক্তিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খলজি সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। ইক্তিয়ারউদ্দিন মহম্মদের নদীয়া-বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা কর। তিনি মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে নদীয়া অধিকার করেছিলেন—এ সম্পর্কে তোমার মত কি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বাধীন সুলতানি আমল (১৩৩৯-১৫৩৮)

দিল্লীর অধীন বাংলা।—১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হ'লে তাঁর সেনাপতি **কুতবুদ্দিন আইবক** মুসলিম-বিজিত ভারতের অধীশ্বর হলেন। মুসলিম-বিজিত বাংলাদেশও তাঁর অধীন হ'লো। এখন থেকে দিল্লীর সুলতানরাই বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। ক্রমেই সারা বাংলাদেশ মুসলিম অধিকারে গেল। বাংলাদেশ দিল্লী থেকে বেশ দূরে হওয়ায় বাংলার শাসনকর্তারা প্রায়ই বিদ্রোহ করতেন। বাংলার শাসনকর্তা **তুঘরিল খাঁ** বিদ্রোহী হ'লে সুলতান **গিয়াসুদ্দিন বলবন** তাঁর বিদ্রোহ দমন ক'রে নিজ পুত্র **বঘরা খাঁকে** বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন (১২৮০)। বঘরা খাঁর বংশধরদের মধ্যে বিবাদ বাধলে দিল্লীর সুলতান **গিয়াসুদ্দিন তুঘলক** নিজে বাংলাদেশে গিয়ে নূতন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বাংলার শাসনকর্তারা যাতে শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারেন, সেজন্য তিনি বাংলাকে তিনটি এলাকায় ভাগ করেন। প্রত্যেক এলাকার জন্য একজন ক'রে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। **লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁ** (সপ্তগ্রাম) ও পূর্ববঙ্গে **সোনারগাঁ** ঐ শাসনকর্তাদের রাজধানী হয়।

গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের পর দিল্লীর সুলতান হন **মহম্মদ বিন্ তুঘলক**। তাঁর অত্যাচার ও খামখেয়ালিতে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। মহম্মদ বিন্ তুঘলক ঐসব বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার সুযোগে সোনারগাঁর শাসনকর্তা **ফকরুদ্দিন মবারক শাহ্** ও লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা **আলাউদ্দিন আলি শাহ্** স্বাধীন হন।

সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্।—কিন্তু শীঘ্রই **হাজী ইলিয়াস** নামে এক ব্যক্তি লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন অধিকার করেন। হাজী ইলিয়াসের বংশ পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় নি। কারো মতে, তিনি আলাউদ্দিন আলি শাহের ধাত্রীপুত্র ছিলেন। আলাউদ্দিন আলি শাহ্ তাঁকে উচ্চপদে নিয়োগ করেন। ইলিয়াস সম্ভবত পূর্ব ইরানের

লোক ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে মক্কায় 'হজ' করায় 'হাজী' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। একই সময়ে আলাউদ্দিন আলি শাহ্ ও ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়। তাই অনেকে মনে করেন, আগে ইলিয়াস সাতগাঁ অধিকার করেন। এর দু-এক বছর পরে তিনি আলাউদ্দিন আলি শাহ্‌কে হত্যা ক'রে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেছিলেন (আঃ ১৩৪৩)। তিনি সুলতান হয়ে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ নাম নেন। তিনি সম্ভবত ভাং খেতেন; তাই ভাংরা নামে প্রসিদ্ধ।

সুলতান হয়েই ইলিয়াস শাহ্ রাজ্যবিস্তারে মন দেন। তিনি নেপাল ও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। ঐসব স্থান তাঁর অধিকারভুক্ত না হ'লেও তিনি বহু দেবমন্দির ধ্বংস ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তিনি ফকরুদ্দিন মবারক শাহের পুত্র ইক্তিয়ারউদ্দিন গাজী শাহ্‌কে পরাজিত ক'রে সোনারগাঁ অধিকার করেন। এইভাবে সমগ্র বাংলাদেশ তাঁর শাসনাধীন হয়। বিহারের একটি সুবৃহদংশও তিনি রাজ্যভুক্ত করেন।

১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন্ তুঘলকের মৃত্যু হ'লে তাঁর পিতৃব্যপুত্র ফিরোজ শাহ্ তুঘলক দিল্লীর সুলতান হন। তিনি বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহ্ **একডালা** নামে এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজ শাহ্ বহু চেষ্টা ক'রেও ঐ দুর্গ জয়ে ব্যর্থ হন। দিল্লীর সুলতানের অনুগত ঐতিহাসিকরা এই যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের পরাজয়ের কথা লিখলেও তা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, ইলিয়াস শাহ্ তার পরেও স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকেন। সম্ভবত ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয়।

ইলিয়াস শাহ্ সামান্য ব্যক্তি থেকেই এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তাঁর বংশে আরও কয়েকজন কৃতি সুলতানের জন্ম হয়েছিল। তাঁর বংশ **ইলিয়াস শাহী** বংশ নামে পরিচিত। ইলিয়াস শাহ্ হিন্দু-মুসলমান উভয়ের প্রিয় ছিলেন। কারণ, একডালার যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের প্রধান সহায় ছিল হিন্দু পদাতিক বাহিনী ও তাদের সেনাপতি **সহদেব**।

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ্।—ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর

পুত্র সিকন্দর শাহ্ রাজা হন। তিনিও পিতার মতোই বীর ছিলেন। তাঁর সময়েও ফিরোজ শাহ্ তুঘলক বাংলা আক্রমণ ক'রে ব্যর্থ হন। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ তাঁরই কীর্তি। এতো বড় মসজিদ পৃথিবীতে খুব অল্পই আছে। সিকন্দর ছিলেন হৃদয়বান্ ও স্নেহশীল পিতা। কিন্তু তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম বিমাতার চক্রান্তে ভীত হয়ে রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করেন ও বিদ্রোহী হন। পিতা-পুত্রে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সিকন্দর শাহ্ মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং পুত্র-ক্রোড়েই প্রাণত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দিন আজম বাংলার সুলতান হন।

গিয়াসুদ্দিন আজম ছিলেন বীর, ন্যায়পরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ, কবি ও কূটনীতিজ্ঞ। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা গল্প-কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তিনি একবার অতর্কিতে এক বিধবার পুত্রকে তীরবিদ্ধ ক'রে হত্যা করেছিলেন। বিধবা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কাজী তাঁকে ডেকে পাঠান। সুলতান আদালতে উপস্থিত হয়ে কাজীর দণ্ড মাথা পেতে নেন এবং কাজীকে বলেন, কাজী তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করলে তিনি তাঁকে হত্যা করতেন। কাজীও বলেন, সুলতান যদি তাঁর দণ্ডাদেশ পালন না করতেন, তবে তিনি তাঁকে বেত্রাঘাত করতেন।

গিয়াসুদ্দিন ছিলেন কবি। তিনি একবার এক কলি কবিতা লিখে পাদপূরণের জন্য কবিতাটি তৎকালীন পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি **হাফিজের** কাছে পাঠিয়েছিলেন। হাফিজ কবিতাটির পাদপূরণ ক'রে পাঠান এবং একটি গজল (প্রেমগীতি) সুলতানকে উপহার দেন। হাফিজের সঙ্গে সুলতানের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। হাফিজ বাংলাদেশে আসবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। তবে বৃদ্ধ হওয়ায় তিনি তা পারেন না।

গিয়াসুদ্দিন আজমই চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি চীনদেশে বহু মূল্যবান উপহারসহ দূত পাঠান। চীনসম্রাটও সুলতান এবং সুলতানের বেগমের জন্য বহুমূল্য উপহার-সহ দূত পাঠান। চীনা দূতের সঙ্গে দোভাষীরূপে এসেছিলেন **মা হুয়ান** নামে এক চীনা। মা হুয়ান ঐ সময়কার বাংলাদেশ সম্পর্কে

যে বিবরণ লিখে গেছেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান। চীনের সঙ্গে গিয়াসুদ্দিন আজম যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

ইসলামে তাঁর গভীর নিষ্ঠা ছিল। সেকালের বিখ্যাত দরবেশ **মুজফ্‌ফর শালস্ বলখি** তাঁকে স্নেহপূর্ণ উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি ন্যায়পরায়ণ ও হৃদয়বান্ হওয়ায় পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি মক্কায় ও মদিনায় দুটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। এই দুটি মাদ্রাসার সমস্ত ব্যয় তিনি বহন করতেন। সম্ভবত ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা গণেশ।—গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা রাজা হন। কিন্তু তাঁরা কেউ সুযোগ্য ছিলেন না। তাঁদের শাসনকালে **গণেশ** নামে এক হিন্দু জমিদার রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। গণেশ ছিলেন ভাতুড়িয়ার জমিদার। তিনি গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের আমলে রাজস্ব-বিভাগের কর্তা ছিলেন; পরে নিজ বুদ্ধিবলে দেশের হিন্দু ও মুসলমান-প্রধান ব্যক্তিদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের বংশধরদের সিংহাসনে বসিয়ে তাঁদের নামেই রাজ্যশাসন করতে থাকেন। শেষে তিনি আজম শাহের শেষ বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে নিজেই রাজা হন।

বাংলাদেশে পুনরায় হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় দরবেশ ও মোল্লারা তাঁর বিরোধিতা করতে থাকেন। তিনি এইসব মোল্লা ও দরবেশদের কঠিন শাস্তি দেন। ঐ সময়কার বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ দরবেশ **নূর কুতব উল্ আলম** বিধর্মীর বিরুদ্ধে **জৌনপুরের** সুলতান **ইব্রাহিম শর্কিকে** বাংলাদেশ আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। ইব্রাহিম শর্কি বাংলাদেশ আক্রমণ করলে গণেশ পরাজিত হন। তখন তাঁর পুত্র **যদুকে** ইসলামধর্মে দীক্ষিত ক'রে সিংহাসনে বসানো হয়। এখন যদুর নাম হয় **জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ**। ইব্রাহিম শর্কি স্বরাজ্যে ফিরে গেলে যদু বা জালালুদ্দিনকে অপসারিত ক'রে গণেশ পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন। এখন তিনি **দনুজমর্দন দেব**

নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকাল দীর্ঘ হয় না। সম্ভবত দ্বিতীয়বার রাজ্যলাভের বৎসরাধিক কাল পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

গণেশ রাজা হওয়ায় বাংলাদেশে স্থায়ী হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়নি সত্য, কিন্তু ঐ সময়ে বাংলাদেশে হিন্দুরাও যে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানরা যোগ্যতার ভিত্তিতে দেশশাসনে অংশগ্রহণ করতেন, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। গণেশ মুসলমানদের কাছেও প্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে মুসলমানরা মুসলিম রীতিতে কবর দিতে চেয়েছিলেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্।—গণেশের মৃত্যুর পর জালালুদ্দিন বাংলার সুলতান হন। জালালুদ্দিনের পুত্র সুলতান শামসুদ্দিন আহম্মদ শাহ্ ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হ'লে আবার ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ কিছুদিন রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন **রুকনুদ্দিন বারবক শাহ্**। এঁর বংশধরদের সময়ে বাংলাদেশে আফ্রিকার আবিসিনিয়ার অধিবাসী হাবসীরা খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। হাবসীরা প্রাসাদরক্ষী বাহিনীতে এবং উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকতো। এই সুযোগে তারা সিংহাসন অধিকার করে। কিন্তু হাবসী শাসন বাংলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। হাবসী রাজা **শামসুদ্দিন মজফ্ফর শাহকে** হত্যা ক'রে **সৈয়দ হুসেন** বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি **আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্** নাম গ্রহণ করেন।

হুসেন শাহের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে তিনি রংপুরেরই অধিবাসী ছিলেন। মতান্তরে বলা হয়, তিনি ছিলেন আরবদেশের অধিবাসী এবং সৈয়দ। সৈয়দ—অর্থাৎ হজরত মহম্মদ যে বংশে জন্মেছিলেন, সেই বংশেরই লোক। তিনি তাঁর পিতা সৈয়দ **আশরফ আল্-হোসেনের** সঙ্গে বাংলাদেশে আসেন এবং মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকেন। তাঁর বংশমর্যাদার কথা জানতে পেরে স্থানীয় কাজী তাঁর সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। ঐ সময় **সুবুদ্ধি** রায় নামে এক হিন্দু সুলতানের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন।

সৈয়দ হুসেন সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কিছুদিন কাজ করেন এবং পরে রাজকার্যে নিযুক্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রতিভাবলে হাবসী স্থলতান মুজফ্‌ফর শাহের উজির বা প্রধান মন্ত্রী হন।

মুজফ্‌ফর শাহ্‌ অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সৈয়দ হুসেন মুজফ্‌ফর শাহকে হত্যা ক'রে সিংহাসন অধিকার করেন (১৪৯৩ খ্রীঃ)।

হুসেন শাহ্‌ অবিলম্বে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বাংলাদেশ থেকে হাবসীদের বিতাড়িত করেন। প্রাসাদরক্ষীরা প্রায়ই চক্রান্তে লিপ্ত হ'তো ব'লে তিনি প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে দেন।

হুসেন শাহ্‌ বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বিহারের অধিকাংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। দিল্লীর স্থলতান সিকন্দর লোদী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পর সন্ধি ক'রে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তিনি করতোয়া নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত কামতা-কামরূপ রাজ্য অধিকার করেন। তিনি আসাম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও আরাকানের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেন। ঐসব যুদ্ধে তিনি পুরোপুরি সাফল্য লাভ না করলেও ঐসব রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়।

হুসেন শাহ্‌ ধর্মীয় উদারতার জন্য সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর সময়ে বহু হিন্দু রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। দুইজন হিন্দু ছিলেন তাঁর মন্ত্রী ও একান্ত সচিব। এঁরা পরে **রূপ-সনাতন** নামে বিখ্যাত হন। এঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যধিক ছিল। লোকে সনাতনকে 'সাকর মালিক' (ছোট রাজা) বলত। হুসেন শাহের আমলের সর্বাধিক স্মরণীয় ঘটনা **শ্রীচৈতন্যের** আবির্ভাব। হুসেন শাহ্‌ শ্রীচৈতন্যকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। একবার শ্রীচৈতন্য গঙ্গাতীর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হাজার হাজার লোক তাঁর সঙ্গে চলেছিল। হুসেন শাহ্‌ প্রাসাদশীর্ষ থেকে এই দৃশ্য দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এত লোক কেন ?" তাঁর সঙ্গী বলেছিলেন, "একজন দরিদ্র সন্ন্যাসীকে দেখবার জন্য।" হুসেন শাহ্‌ বললেন, "আমি সকলকে এত অর্থ

দিই, তবু সকলের মন পাই না। কিন্তু এই নিঃস্ব সন্ন্যাসীর পেছনে দলে দলে লোক ছুটছে। নিশ্চয় ইনি মহাপুরুষ।"

হুসেন শাহ্ ছিলেন সুশাসক। তিনি বাংলা-সাহিত্যেরও উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়েই গৌড়ের বিখ্যাত ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয়। তিনি যে বাংলার সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ্।—হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ্ রাজা হন। তিনি তিব্বত অধিকার করেন। তিনি আসামেও অভিযান করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মুঘল বীর **বাবর** দিল্লী অধিকার ক'রে তাঁর রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন। ফলে নসরত শাহের সঙ্গে বাবরের সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু নসরত শাহের শক্তি সম্পর্কে বাবর সচেতন ছিলেন। নসরত শাহ্ও বাবরের বীরত্বের কথা জানতেন। তাই উভয়ের মধ্যে সম্মানজনক সন্ধি ও বন্ধুত্ব হয়। ধর্ম সম্পর্কে পিতার মতোই নসরত শাহ্ উদার ছিলেন। তিনিও পিতার মতোই বাংলা-সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ ও কদম রসুল মসজিদ তাঁরই কীর্তি। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে নসরত শাহের মৃত্যু হয়।

সুলতানি আমলে সাহিত্য।—শ্রেষ্ঠ সুলতানরা সকলেই বাংলা-সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা নিজেরাও অনেকে সাহিত্যরসিক ছিলেন। তাই তাঁরা ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুর পুরাণ কাহিনীগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করাতেও কুণ্ঠিত হন নি। এই যুগেই **বড়ু চণ্ডীদাস** তাঁর **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন** কাব্য রচনা করেছিলেন। **কৃত্তিবাস ওঝা** রচনা করেছিলেন তাঁর **শ্রীরামপাঁচালী** বা রামায়ণ। কৃত্তিবাসকে সম্ভবত সুলতান বারবক শাহ্ই সম্মানিত করেন। **মালাধর বসু** রচনা করেছিলেন তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ **শ্রীকৃষ্ণবিজয়**। বারবক শাহ্ (মতান্তরে হুসেন শাহ্) তাঁকে **গুণরাজ খাঁ** উপাধি দিয়েছিলেন। বরিশালের কবি **বিজয় গুপ্ত** এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত **মনসামঙ্গল** কাব্য রচনা করেছিলেন। হুসেন

শাহের সেনাপতি **পরাগল খাঁর** আদেশে **কবীন্দ্র পরমেশ্বর** মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ ক'রে **পাণ্ডববিজয় কাব্য** রচনা করেছিলেন। পরাগল খাঁর পুত্র **ছুটি খাঁর** নির্দেশে **শ্রীকর নন্দী** মহাভারতের একাংশ অনুবাদ করেছিলেন। এই যুগেই **বিপ্রদাস পিপিলাই** রচনা করেছিলেন তাঁর **মনসামঙ্গল কাব্য**। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে **বৈষ্ণবপদাবলী** ও চৈতন্যজীবনী সাহিত্য রচনারও সূচনা হয়েছিল এই যুগেই। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাস তাঁর সুবৃহৎ **চৈতন্যভাগবত** রচনা করেছিলেন।

এই যুগে সংস্কৃত ভাষাতেও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সংস্কৃত গ্রন্থকারদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের শিক্ষক **বৃহস্পতি মিশ্র, শূলপাণি** এবং **রঘুনন্দন ভট্টাচার্য**। স্মৃতিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য রঘুনন্দন **স্মার্ত রঘুনন্দন** নামে পরিচিত ছিলেন।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা—সমাজ ও ধর্ম-সংস্কার।—মুসলমান আক্রমণের গোড়ার যুগে হিন্দুরা মুসলমানদের 'যবন' ও 'ম্লেচ্ছ' ব'লে ঘৃণা করতো। মুসলমানরাও হিন্দুদের বলত 'কাফের' (বিধর্মী) ও 'জিম্মি' (আশ্রিত)। বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে মুসলমান আসতে থাকে, এদেশের বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মুসলমান হয়। ফলে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হিন্দু ও বৌদ্ধরা মুসলমান হওয়ায় মুসলিম সমাজে এদেশীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার প্রবেশ করে। দেশে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এবং শাসকরা মুসলমান হওয়ায় হিন্দুসমাজেও মুসলিম রীতিনীতি আসে। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল', বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' প্রভৃতি সমসাময়িক গ্রন্থে হিন্দুদের উপর মুসলমানের অত্যাচারের বহু কাহিনী বর্ণিত হ'লেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব ছিল। সুলতানরা ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করায় এবং হিন্দুরা রাজকার্যে অত্যুচ্চ পদে নিযুক্ত থাকায় হিন্দুরা ক্রমেই ভয়ের মনোভাব কাটিয়ে উঠেছিল। মুসলমান সুলতানরা অন্য রাজ্য আক্রমণ করলে প্রায়ই দেবমন্দির ধ্বংস করতেন। কিন্তু তা তাঁরা ধর্মীয় কারণে করতেন না। সে যুগে

দেবমন্দিরগুলিতে প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকতো, তাই সেগুলি লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই আক্রমণ করতেন। সুলতান ও আমীর-ওমারহ্‌রা যে ধর্ম সম্পর্কে কতোখানি উদার ছিলেন, তার প্রমাণ বারবক শাহ্‌, হুসেন শাহ্‌, নসরত শাহ্‌ প্রভৃতির মতো সুলতান এবং পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর মতো সেনাপতিরা শ্রীমদ্ভাগবত, মনসামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু গ্রন্থের রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে সুফী সম্প্রদায় এবং হিন্দুদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের মতো ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাবে পরধর্মসহিষ্ণুতা আরো বৃদ্ধি পায়।

অবশ্য, ইসলামের প্রভাব থেকে হিন্দুসমাজকে বাঁচাবার জন্য নানাপ্রকার কঠোর বিধিনিষেধও আরোপ করা হ'তে থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রগুলির রচনা ও প্রচার বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতরা হিন্দুদের অবশ্য করণীয় রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ প্রচার করেন। হিন্দুসমাজে অবরোধ-প্রথা বৃদ্ধি পায়। পোশাক-পরিচ্ছদেও পরিবর্তন আসে।



শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবধর্মের প্রসার।—শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত নাম **বিশ্বম্ভর**। তাঁর পিতা **জগন্নাথ মিশ্র** শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বাস করতে থাকেন। তাঁর স্ত্রীর নাম **শচীদেবী**। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র **বিশ্বরূপ** অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করেন। তারপর ১৪৮৬খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় জগন্নাথ মিশ্রের আর এক পুত্র হয়। এঁর নাম রাখা হয় **বিশ্বম্ভর**। বিশ্বম্ভরের বর্ণ গৌর ছিল ব'লে তাঁকে গৌরাঙ্গ, গৌর, গোরা প্রভৃতি নামেও

ডাকা হ'তো। বাপ-মা তাঁকে আদর ক'রে ডাকতেন নিমাই ব'লে। বাল্যকালে নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী।

তিনি অল্প বয়সেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং নবদ্বীপে টোল খুলে বসেন। এই সময়ে **কেশব কাশ্মীরী** নামে এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে এলে নিমাই তাঁকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। নিমাইয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশবিদেশের বহু ছাত্র তাঁর টোলে পড়তে আসে। ইতিপূর্বেই জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হয়েছিল। নিমাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল বল্লভাচার্যের কন্যা **লক্ষ্মীদেবীর**। নিমাই পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গেলে সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়। মাতার অনুরোধে নিমাই পুনরায় বিবাহ করেন—রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা **বিষ্ণুপ্রিয়াকে**। এরপর তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গয়া যান। সেখানে **ঈশ্বরপুরী** নামে এক সন্ন্যাসী তাঁকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। নিমাইয়ের জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আসে। তিনি অহোরাত্র কৃষ্ণনাম করতে থাকেন, কৃষ্ণবিরহে আকুল হন, টোল ভেঙ্গে দিয়ে নবদ্বীপের পথে পথে সংকীর্তন ক'রে বেড়াতে থাকেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে দলে দলে মানুষ এসে তাঁর সংকীর্তনে যোগ দেয়। কাজী সংকীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু অগণিত জনসমাগম দেখে ভয় পেয়ে নিরস্ত হয়। এইভাবে এক বৎসর অতীত হওয়ার পর নিমাই কাটোয়ায় **কেশব ভারতীর** কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এখন তাঁর নাম হয় **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**, সংক্ষেপে **চৈতন্য**। তখন চৈতন্যের বয়স চব্বিশ বৎসর।

অতঃপর তিনি পুরীধামে যান। উড়িষ্যার রাজা **প্রতাপরুদ্রদেব** তাঁর শিষ্য হন। তারপর চৈতন্য দক্ষিণ ভারত, গুজরাট, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ ক'রে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তাঁর ধর্মের প্রধান কথা হরিভক্তি ও জীবে দয়া। হুসেন শাহের দুইজন হিন্দু মন্ত্রী ও বিজয়নগরের মন্ত্রী রামানন্দ তাঁর শিষ্য হন। হুসেন শাহের এই দুই মন্ত্রী ছিলেন দুই ভাই; চৈতন্য বড় ভাইয়ের নাম রাখেন

সনাতন এবং ছোট ভাইয়ের নাম রাখেন রূপ। রূপ-সনাতন অতুল ঐশ্বর্য ও বিপুল মর্যাদা হেলায় বিসর্জন দিয়ে বৃন্দাবনবাসী হন। এইভাবে ছ' বছর ধর্মপ্রচারের পর চৈতন্য পুরীধামে আসেন এবং জীবনের শেষ আঠারো বছর পুরীধামেই অতিবাহিত করেন। পুরীতে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে।

যাগযজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠানে পূর্ণ হিন্দুসমাজে চৈতন্য এক নব ভাবের বন্যা আনেন। বাংলার জনসমাজে তিনি এক অভিনব উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। তাঁর আবির্ভাব বাংলা-সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বৃন্দাবন ও মথুরা প্রায় পরিত্যক্ত পড়ে ছিল। চৈতন্যের পদার্পণে এবং চৈতন্যভক্তদের সমাবেশে বৃন্দাবন ও মথুরা সঞ্জীবিত হয়। সংসারত্যাগী অসংখ্য বিত্তশালী বাঙ্গালীর বিপুল অর্থে বৃন্দাবন ও মথুরা নবরূপ ধারণ করে। বৃন্দাবন ও মথুরা এখন সারা ভারতের বৈষ্ণবদের মিলনস্থানে পরিণত হয়। চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণবধর্ম সারা ভারতে বিস্তার লাভ করে।

বাংলার সুলতানদের বংশাবলী

ইলিয়াস-শাহী বংশ

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্
(আঃ ১৩৪৩—১৩৫৭)
|
সিকন্দর শাহ্
(আঃ ১৩৫৭—১৩৯৩)
|
গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ্
(১৩৯৩—১৪১০)
|
সৈফুদ্দিন হাজমা শাহ্
(১৪১০—১৪১২)
|
শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ
(১৪১২—১৪১৪)

রাজা গণেশের বংশ

রাজা গণেশ
(১৪১৪—১৪১৮)
|
জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ্
(১৪১৪ ; ১৪১৮—১৪৩১)
|
শামসুদ্দিন আহম্মদ শাহ্
(১৪৩১—৪২)

পরবর্তী ইলিয়াস-শাহী বংশ

নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ্ (১৪৪২—১৪৬০)

- রুকনুদ্দিন বারবক শাহ্ (১৪৬০—১৪৭০)
  - শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭০—১৪৭১)
- জালালুদ্দিন ফতে শাহ্ (১৪৭১—১৪৮১)

হুসেন-শাহী বংশ

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩—১৫১৮-১৯)

- নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ্ (১৫১৯—১৫৩২)
  - আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২)
- গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ্ (১৫৩৩—১৫৩৮)

অনুশীলনী

১। সুলতান ইলিয়াস শাহ্ সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজমের জীবন ও কৃতিত্বের বিবরণ দাও।

৩। রাজা গণেশের জীবন ও প্রতিভা বর্ণনা কর।

৪। হুসেন শাহ্ সম্পর্কে যা জান লিখ। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ কি?

৫। সুলতানি আমলের সাহিত্য ও ধর্মসহিষ্ণুতার বিবরণ দাও।

৬। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বৈষ্ণবধর্ম বিস্তারের বিবরণ লিখ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুঘল প্রতিরোধ : ইশা খাঁ, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য

মুঘল শাসনের সূচনা।—নসরত শাহের রাজত্বকালেই মুঘল বীর **জহিরুদ্দিন বাবর** মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৫২৬ খ্রীঃ)। তাঁর সাম্রাজ্য বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হ'লে বাদশা হলেন তাঁর পুত্র **হুমায়ুন**। এর অল্পদিন বাদেই বিহারে আফগান বীর **শের খাঁ শুর** শক্তিশালী হয়ে উঠলেন এবং বিহারের রাজা হলেন। ঐ সময়ে বাংলাদেশের সুলতান ছিলেন হুসেন শাহের অন্যতম পুত্র **গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ্**। তিনি শের শাহের হস্তে পরাজিত হলেন। শের খাঁর অভ্যুত্থানের সংবাদ পেয়ে হুমায়ুন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। হুমায়ুন শের খাঁর হস্তে পরাজিত হলেন। শের খাঁ **শের শাহ্** নামে দিল্লীর সম্রাট হলেন। এইভাবে বাংলাদেশে আফগান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'লো।



আকবর

কিন্তু শের শাহের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অকস্মাৎ ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শের শাহের মৃত্যুর দশ বছর পরে তাঁর উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতার সুযোগে হুমায়ুন আবার পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। এর এক বৎসর পরে (১৫৫৬) হুমায়ুনের মৃত্যু হ'লে তাঁর পুত্র আকবর দিল্লীর বাদশাহ্ হন। কয়েক বৎসরের মধ্যে **আকবর** আফগান শক্তি নির্মূল করলেন। কিন্তু **সুলেমান কররানি** নামে জনৈক আফগান মুঘলের বশ্যতা স্বীকার ক'রে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় রাজত্ব করতে লাগলেন। সুলেমান কররানির মৃত্যুর

পর তাঁর পুত্র দাউদ খাঁ রাজা হলেন। তিনি মুঘলের বশ্যতা অস্বীকার করলেন। ফলে দাউদ খাঁর সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ বাধলো। দাউদ খাঁ যুদ্ধে নিহত হ'লে বাংলাদেশ মুঘল অধিকারে গেল (১৫৭৬)।

কিন্তু বাংলাদেশ সহজে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করলো না। বাংলাদেশের শক্তিশালী জমিদার বা ভুঁইয়ারা মুঘলের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন **ইশা খাঁ, কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য**।

ইশা খাঁ।—ইশা খাঁর পিতা **কালিদাস গজদানি** ছিলেন হিন্দু রাজপুত। তিনি পরে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র ইশা খাঁ পূর্ববঙ্গের এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। তিনি স্বাধীন রাজার মতোই রাজ্যশাসন করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল নারায়ণগঞ্জের কাছে খিজিরপুরে। তিনি সহজে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেন না। তিনি বিদ্রোহী আফগান নায়ক মাসুম খাঁকে আশ্রয় দেন। মুঘল সেনাপতি তরসুন খাঁ তাঁর হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। তিনি ঢাকা আক্রমণ ক'রে মুঘল সেনাপতি শাহ্‌বাজ খাঁকে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করেন। কিছুদিনের জন্য মুঘলের সঙ্গে তাঁর সন্ধি হয়। ঐ সময় বাংলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন আকবরের সেনাপতি **রাজা মানসিংহ**। মানসিংহ ইশা খাঁর রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করলে আবার মুঘলের সঙ্গে ইশা খাঁর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে ইশা খাঁর হস্তে মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ নিহত হন। পর বৎসর মুঘলের সঙ্গে ইশা খাঁর সন্ধি হয়। ইশা খাঁ মুঘলের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেন। আকবর তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ইশা খাঁকে **মসনদ আলি** উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইশা খাঁর মৃত্যু হয়। ইশা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুশা খাঁ বিদ্রোহ করেন। মুশা খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। ইশা খাঁর রাজ্য সরাসরি মুঘল অধিকারে যায়।

কেদার রায়।—কেদার রায় দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁর অধিকার বিস্তার করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল ঢাকা

বিক্রমপুর জেলার **শ্রীপুরে**। মুঘল, আরাকানরাজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে সন্দ্বীপ নিয়ে বিবাদ চলছিল। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে কেদার রায় সন্দ্বীপ অধিকার করলে মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। তাঁর হস্তে মুঘল সেনাপতি মুণ্ডা রায় পরাজিত ও নিহত হন। রাজা মানসিংহ কেদার রায়কে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেদার রায় বশ্যতা স্বীকার করলেন না। তিনি পর্তুগীজদের সাহায্যে তাঁর নৌবাহিনীকে দুর্ধর্ষ ক'রে তুললেন। তাঁর নৌ-সেনাপতি হলেন পর্তুগীজ **কার্ভালো**। তাঁর বীরত্বে মুঘলবাহিনী ক্রমাগত বিব্রত হ'তে লাগলো। কিন্তু মানসিংহের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অকস্মাৎ কেদার রায় মারাত্মকভাবে আহত হলেন। আহত অবস্থায় তিনি বন্দী হলেন। বন্দী অবস্থায় ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মতান্তরে, মানসিংহ-নিয়োজিত আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন।

প্রতাপাদিত্য।—মুঘল প্রতিরোধে যিনি সর্বাধিক বীরত্ব ও দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন, তিনি প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্যের পিতা **শ্রীহরি** বা **শ্রীহর্ষ** সুলেমান কররানি ও দাউদ খাঁর অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। দাউদ খাঁর মৃত্যুর পর তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বিপুল ধনরত্ন নিয়ে যশোহরে চলে আসেন। দক্ষিণবঙ্গের এক সুবিস্তৃত অঞ্চল তাঁর শাসনাধীন হয়। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি আকবর বাদশাকে নিয়মিত রাজকর পাঠিয়ে প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করতেন।

কিন্তু প্রতাপাদিত্য ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি ক্ষমতা লাভ ক'রেই মুঘলের অধীনতা থেকে মুক্তি পেতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। তিনি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন। পর্তুগীজদের সহায়তায় গড়ে তুললেন দুর্ধর্ষ নৌবহর। রাজধানী স্থাপন করলেন যমুনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে **ধুমঘাটে**।

ইতিমধ্যে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয়েছিল। সম্রাট হয়েছিলেন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর। ইশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি বীররাও জীবিত ছিলেন না। তাই প্রতাপকে একাকীই মুঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

চালাতে হ'লো। প্রতাপাদিত্য নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণা করায় মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলো। ঐ সময়ে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন **ইসলাম খাঁ**। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য আক্রমণ করলেন। মুঘল বাহিনীর সঙ্গে জলে স্থলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'লো। যুদ্ধে প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য পরাজিত হলেন। তাঁর দুর্ধর্ষ নৌবহর বিধ্বস্ত হ'লো। কিন্তু তবু প্রতাপ বশ্যতা স্বীকার করলেন না। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘল শক্তির কাছে তাঁকে পরাস্ত হ'তে হ'লো। তিনি ও তাঁর পুত্রেরা বন্দী হলেন।


জাহাঙ্গীর

ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য অধিকার ক'রেই সন্তুষ্ট হলেন না। বন্দীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করলেন। প্রতাপাদিত্যকে বন্য পশুর মতো লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ ক'রে দিল্লীর দরবারে পাঠালেন। কিন্তু পথিমধ্যে বারাণসীতে বন্দী অবস্থায় প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হ'লো (১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এইভাবে বাংলায় মুঘল প্রতিরোধের শেষ দীপশিখাও নির্বাপিত হ'লো।

অনুশীলনী

১। বাংলায় মুঘল অধিকারের সূচনা সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। মুঘল প্রতিরোধে হিন্দু ও মুসলমান বীরগণের সংগ্রামের বিবরণ দাও।

৩। প্রতাপাদিত্যের জীবন ও স্বাধীনতা-যুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। টীকা লিখ: ইশা খাঁ, কেদার রায়।

নবম পরিচ্ছেদ

বাংলায় মুঘল শাসন—নবাবি আমল

মুঘল শাসনে বাংলা।—প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে মুঘল শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হ'লো। মুঘল সাম্রাজ্য কতকগুলি স্থবায় বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। বাংলাদেশও ছিল একটি সুবা। সুবার শাসনকর্তাকে বলা হ'তো **স্থবাদার**। আকবর থেকে ঔরংজেব পর্যন্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুঘল সম্রাটরা খুশিমত সুবাদার নিযুক্ত করতেন। বাদশার নির্দেশমতোই সুবাদাররা চলতেন। বাংলার সুবাদার পদটি যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ছিল। জাহাঙ্গীরের শ্যালক ও অম্বরের রাজা মানসিংহ, সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র শাহ্‌জাদা সুজা, ঔরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি মুঘল সাম্রাজ্যের অতিশয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বাংলার সুবাদার হয়েছিলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী বাদশারা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁদের সময়ে চক্রান্ত ও গৃহযুদ্ধ লেগেই ছিল। এই সুযোগে স্থবাদাররা প্রায়ই শক্তিশালী হয়ে উঠতেন। তাঁরা দিল্লীকে রাজকর দিয়েই প্রায় স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতেন। তাঁরা নিজেরা তাঁদের পরবর্তী সুবাদার অর্থাৎ উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। বাদশার কাছে নিয়মিত রাজকর ও নজরানা পাঠালেই যথেষ্ট হ'তো। বাংলার সুবাদাররাও শেষ দিকে এই রকম স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা নবাব নামেই পরিচিত হতেন।

মুর্শিদ কুলী খাঁ।—সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন মুর্শিদ কুলী খাঁ নামে একজন ইরানী কর্মচারী দাক্ষিণাত্যে মুঘল-অধিকৃত অঞ্চলে রাজস্ব-ব্যবস্থার উন্নতি ক'রে খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ঔরংজেব সম্রাট হয়ে বাংলাদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থার উন্নতি করবার জন্য তাঁকে বাংলাদেশে পাঠালেন। ঔরংজেবের মৃত্যুকালে মুর্শিদ কুলী খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্তা এবং বাংলাদেশের নায়েব-নাজিম বা সহকারী শাসনকর্তা

ছিলেন। তবে ঐ দুই প্রদেশেরই তিনি ছিলেন ‘দেওয়ান’ বা রাজস্ববিভাগের কর্তা।

ঔরংজেবের প্রপৌত্র **ফারুকশিয়র** যখন সম্রাট হলেন, তখন তিনি মুর্শিদ কুলী খাঁকে বাংলাদেশেরও শাসনকর্তা ক’রে দিলেন। এইভাবে মুর্শিদ কুলী খাঁ হলেন বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার। এতোদিন ঢাকায় ছিল মুঘল-শাসিত বাংলার রাজধানী। মুর্শিদ কুলী খাঁ পশ্চিমবঙ্গের মুখসুদাবাদে বাংলার রাজধানী করলেন। তাঁর নাম অনুসারেই ঐ মুখসুদাবাদের নাম হয়েছে **মুর্শিদাবাদ**।

মুর্শিদ কুলী খাঁ কেবল রাজস্ব-ব্যবস্থারই উন্নতি করলেন না, তিনি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটালেন। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও দ্রুত উন্নতি হ’লো। ধনসম্পদে ভরে উঠলো বাংলাদেশ। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যু হয়।

সুজাউদ্দৌলা।—মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত ক’রে যান। কিন্তু মুর্শিদ কুলী খাঁর জামাতা ও সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দিন খাঁ বা সুজাউদ্দৌলা সুকৌশলে নিজেই বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার হন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন তাঁর দুই কর্মচারী—আলিবর্দী খাঁ ও আলিবর্দীর দাদা হাজী আহম্মদ খাঁ।

তিনিও তাঁর শ্বশুরের মতোই অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর শাসনকালেও দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর সময়েই বিহারকেও বাংলা সুবার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এইভাবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা একই শাসনকর্তার অধীন হয়। কথিত আছে, সুজাউদ্দৌলার সময়ে দেশের পণ্যমূল্য অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল। পূর্বে বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ নাকি ঢাকার পশ্চিম দিকে একটি তোরণ নির্মাণ ক’রে তার দরজা বন্ধ ক’রে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, তাঁর চেয়ে দ্রব্যমূল্য যদি কেউ হ্রাস করতে পারে, তবে সে-ই এই তোরণ খুলবার অধিকারী হবে। সুজাউদ্দৌলার কর্মচারী যশোবন্ত

রায় ঐ তোরণদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ শায়েস্তা খাঁর আমলের চেয়েও সুজাউদ্দৌলার সময়ে দ্রব্যমূল্য কম হয়েছিল।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হয়।

সফরাজ খাঁ।—সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকর্তা হলেন। কিন্তু তিনি মাতামহ মুর্শিদ কুলী খাঁ বা পিতা সুজাউদ্দৌলার মতো সুশাসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অসচ্চরিত্র, উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসী ও অত্যাচারী। তাই প্রজারা খুবই বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাছাড়া, তিনি আলিবর্দী খাঁ ও তাঁর দাদা হাজী আহম্মদ খাঁর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। আলিবর্দী ও হাজী আহম্মদ তাঁদের জীবন ও ধনসম্পত্তি বিপন্ন মনে করলেন। ঐ সময়ে আলিবর্দী বিহারের নায়েব-নাজিম ছিলেন। তিনি সসৈন্যে পাটনা থেকে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ক'রে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করলেন (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে)। প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে আলিবর্দী বাদশার কাছ থেকে তাঁর সুবাদার-পদে স্বীকৃতি সংগ্রহ করলেন। এইভাবে আলিবর্দী খাঁ হলেন বাংলার নবাব।

আলিবর্দী খাঁ।—আলিবর্দীর প্রকৃত নাম মির্জা মহম্মদ খাঁ। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন আরব। মির্জা মহম্মদ খাঁর পিতামহ ঔরংজেবের অধীন মনসবদার ছিলেন এবং পিতা ছিলেন ঔরংজেবের অন্যতম পুত্র আজম শাহের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ। গৃহযুদ্ধে আজম শাহের মৃত্যু হ'লে তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়েন। মির্জা মহম্মদ খাঁ ভাগ্যের সন্ধানে নানাস্থানে ঘুরতে ঘুরতে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেন।

তিনি মুর্শিদ কুলী খাঁর কাছে একটি চাকরির জন্য উমেদার হন। কিন্তু মুর্শিদ কুলী খাঁ এই ধরনের ভাগ্যান্বেষী বিদেশীদের পছন্দ করতেন না। তাই তিনি চাকরি দিতে অসম্মত হলেন। ঐ সময়ে সুজাউদ্দৌলা উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম ছিলেন। মির্জা মহম্মদের মা ছিলেন তুর্কী। সেই সূত্রে সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে মির্জা মহম্মদ খাঁর দূর সম্পর্ক ছিল। সুজাউদ্দৌলা মির্জা মহম্মদ খাঁকে একটি চাকরি দেন।

মির্জা মহম্মদের দাদা আহম্মদ খাঁ ইতিমধ্যে মক্কায় হজ ক'রে ফিরেছিলেন। তাঁকে মির্জা মহম্মদ আনেন এবং সুজাউদ্দৌলার অধীনে একটি চাকরি দেন। মির্জা মহম্মদ খাঁ ও হাজী আহম্মদ খাঁ দুজনেই শাসনকার্যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। সুজাউদ্দৌলা বিহারের শাসন-অধিকার পেলে তিনি মির্জা মহম্মদ খাঁকে বিহারের নায়েব-নাজিম বা সহকারী শাসনকর্তা ক'রে দেন এবং তাঁকে আলিবর্দী খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন।

সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত ক'রে আলিবর্দী খাঁ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হন। কিন্তু তাঁর শাসনকালে বাংলাদেশ এক ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হয়।

ঐ সময়ে দক্ষিণ ভারতের মারাঠাদের ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ। দিল্লীর বাদশারাও তাদের সমীহ ক'রে চলতেন। নাগপুরে ছিলেন মারাঠাদের অন্যতম দলপতি **রঘুজী ভোঁসলে**। রঘুজী ভোঁসলের মন্ত্রী **ভাস্কর পণ্ডিতের** নেতৃত্বে মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনী বাংলাদেশে এসে হানা দিল। মারাঠা অশ্বারোহীদের বলা হ'তো **বর্গির** বা বর্গি। মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ **বর্গির হাঙ্গামা** নামে পরিচিত হয়েছে।

বর্গিরা প্রথম আক্রমণ করে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তারা সারা পশ্চিমবঙ্গে—উত্তরে রাজমহল থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর এবং পূর্বে ভাগীরথী পর্যন্ত এক সুবিস্তীর্ণ এলাকায় পঙ্গপালের মতো এসে পৌঁছতো। লুটপাট, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড চালিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিভীষিকা সৃষ্টি করতো। তারা রাজধানী মুর্শিদাবাদেও হানা দিত। একবার আলিবর্দীর জীবনও বিপন্ন হয়েছিল। কিন্তু আলিবর্দী সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রেও তাদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেন না। বছরের পর বছর চললো এই লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড। শেষ পর্যন্ত আলিবর্দী ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে নিজের শিবিরে ডেকে আনলেন এবং ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁর সঙ্গী মারাঠা নায়কদের হত্যা করলেন। কিন্তু তাতেও বর্গির হানা বন্ধ করা গেল না। এইভাবে ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ন বছর কাটলো। শেষে রঘুজী

ভোঁসলের সঙ্গে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ (রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ) দেওয়ার শর্তে আলিবর্দী সন্ধি করলেন। উড়িষ্যায় মারাঠাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হ'লো। বর্গির হাঙ্গামা থেকে দেশ রক্ষা পেলো।

আলিবর্দী সকল বিদেশী বণিককেই সমান চক্ষে দেখতেন। কাউকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। ইংরেজরা দুর্গ নির্মাণ করতে চাইলে তিনি তাদের সুস্পষ্টভাবে ব'লে দিয়েছিলেন, তারা বণিক, তারা নির্ভয়ে ব্যবসা করতে পারে, তাদের রক্ষার দায়িত্ব নবাবের। সুতরাং তাদের দুর্গ নির্মাণের কোনও প্রয়োজন নেই।

আলিবর্দী ছিলেন বিচক্ষণ ও জনপ্রিয় শাসক। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সিরাজদ্দৌলা।—আলিবর্দী ছিলেন অপুত্রক। তিনি তাঁর তিন কন্যার সঙ্গে তাঁর দাদা হাজী আহম্মদের তিন পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। জইনুদ্দিন আহম্মদের সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা **আমিনা বেগমের** বিবাহ হয়েছিল। আলিবর্দী জইনুদ্দিন আহম্মদ ও আমিনার পুত্র **মির্জা মহম্মদকেই** সর্বাধিক স্নেহ করতেন। এই মির্জা মহম্মদই ইতিহাসে **সিরাজদ্দৌলা** নামে পরিচিত হয়েছেন। আলিবর্দী মৃত্যুকালে সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত ক'রে যান।



সিরাজউদ্দৌলা

ফলে তাঁর বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা **ঘসেটি বেগম** এবং মধ্যমা কন্যার পুত্র **সওকত জঙ্গ** অসন্তুষ্ট হন। এই অসন্তোষকে কেন্দ্র ক'রেই সিরাজের বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত গ'ড়ে উঠে। তরুণ সিরাজকে এইসব চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রামে তিনি শেষ পর্যন্ত বিফল হন এবং সিংহাসন ও জীবন দু-ই হারান।

অনুশীলনী

১। বাংলাদেশে মুঘল আমলে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কি জান?

২। আলিবির্দী খাঁর জীবনবৃত্তান্ত লিখ।

৩। টীকা লিখ: (ক) মুর্শিদ কুলী খাঁ; (খ) সুজাউদ্দৌলা; (গ) বর্গির হাঙ্গামা।

দশম পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয়দের আগমন—প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র—ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ—পলাশির যুদ্ধ

নূতন জলপথ আবিষ্কার।—ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জগুলির সঙ্গে ব্যবসা ক'রে ইউরোপীয় বণিকরা খুবই লাভবান হ'তো। কিন্তু ব্যবসা করতে হ'তো স্থলপথে, মধ্যপ্রাচ্যের মধ্য দিয়ে। মধ্যপ্রাচ্য মুসলমানদের অধিকারে থাকায় ইউরোপীয় বণিকদের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তাই ভারতে ও প্রাচ্যদেশে আসবার জন্য জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা চলছিল। এই চেষ্টা করতে গিয়েই নাবিক **কলম্বাস** আমেরিকা মহাদেশে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজ নাবিক **ভাস্কো-ডা-গামা** ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই জলপথ আবিষ্কার করলেন। তিনি আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে ভারতের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছলেন। তখন বাংলাদেশের সুলতান ছিলেন হুসেন শাহ্।

পর্তুগীজদের আগমন।—পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা এই জলপথ আবিষ্কার করায় পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম এদেশে এসে পৌঁছলো। তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করলো। বাংলাদেশেও তারা সুলতান ও বাদশাহের অনুমতি নিয়ে হুগলিতে কুঠি স্থাপন করলো ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে লাগলো। তারা নৌশক্তিতে শক্তিশালী হওয়ায় দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ ও রাজ্যও স্থাপন করলো। এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল

বোম্বাই ও গোয়া। পর্তুগীজরা কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য করতো না, জলদস্যুতাও করতো। তারা সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে হানা দিতো, লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড চালাতো, দলে দলে নরনারী-শিশুদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করতো। তারা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতো। তারা এদেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুল্কও আদায় করতো। তাদের ঔদ্ধত্য এতোই বেড়েছিল যে, তারা শাহ্‌জাহান বাদশার বেগম মমতাজের বাঁদীকে পর্যন্ত আটক করেছিল। ফলে শাহ্‌জাহানের আদেশে বাংলার সুবাদার কাশিম আলি খাঁ পর্তুগীজদের কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। তাই পর্তুগীজরা বাংলাদেশে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পায় নি।

ওলন্দাজদের আগমন।—ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরাও ভারত ও প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসার জন্য উদ্‌যোগী হ'লো। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিকরা এই উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানি গঠন করলো। তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করলো। তারা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায়, চুঁচুড়া, বরানগর, পাটনা ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করেছিল। তবে তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসাতেই বেশি মন দেয়।

ইংরেজদের আগমন।—১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বণিকরাও ভারত ও প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসার জন্য একটি কোম্পানি গঠন করলো। এই কোম্পানির নাম **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি**। মুঘল বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে তারা বাদশার অনুমতি নিয়ে এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করলো। গুজরাট, বোম্বাই, মসুলিপট্টম, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে তারা কুঠি স্থাপন করেছিল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় তারা কুঠি স্থাপন করেছিল হুগলি, কাশিমবাজার, পাটনা ও বালেশ্বরে। ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পর্তুগীজরা পরাস্ত হয়েছিল। ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ওলন্দাজরাও পরাজিত হ'লো। এখন ভারতীয় বাণিজ্যে ইংরেজরাই প্রাধান্য পেলো। কিন্তু তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখা দিলো ফরাসীরা।

ফরাসীদের আগমন।—অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদল গঠিত হওয়ার অনেক পরে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। তারা সুরাট, মসুলিপট্টম, পণ্ডিচেরি, কারিকল, মাহে প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁর অনুমতি নিয়ে তারা চন্দননগরে কুঠি স্থাপন করে।

ইংরেজ-মুঘল বিরোধ—কলকাতার প্রতিষ্ঠা।—ঔরংজেবের শাসনকালের শেষভাগে ইংরেজরা এদেশে বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। শাহ্‌জাহানের মধ্যম পুত্র **শাহাজাদা সুজা** যখন বাংলার সুবাদার ছিলেন, তখন তিনি ইংরেজদের এই সুযোগ দিয়েছিলেন যে, বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বছরে তিন হাজার টাকা দেবে, তাদের কাছে আর কোনও শুল্ক দাবি করা চলবে না। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে **ঔরংজেব** এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ইংরেজরা শতকরা দু টাকা হারে শুল্ক ও দেড় টাকা জিজিয়া (মাথা পিছু কর) দেবে, এর বেশি তাদের কাছে দাবি করা হবে না। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যবসায় ইংরেজদের খুব মুনাফা হচ্ছে এই কারণ দেখিয়ে ক্রমাগত অতিরিক্ত শুল্ক দাবি করতে থাকে। ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত শক্তির দ্বারা এই জুলুমের প্রতিরোধ করবার সংকল্প করে। তারা **হুগলি, হিজলি ও বালেশ্বরে** মুঘল কুঠিগুলি আক্রমণ করে। মুঘল ফৌজ হুগলি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়। তখন ইংরেজরা হিজলি ও বালেশ্বরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। হুগলি কুঠির অধ্যক্ষ **জোব চার্নক** মুঘলের সঙ্গে সন্ধি করতে চান এবং **সুতানুটিতে** ফিরে আসার অনুমতি পান। কিন্তু এই সময়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইংরেজরা কয়েকটি মুঘল দুর্গ অবরোধ করে এবং মুঘল জাহাজ দখল ক'রে নেয়। ঔরংজেব ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। ইংরেজরা ভীত হয়ে বাদশার কাছে মার্জনা চায়। তারা দেড়-লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও মুঘল জাহাজগুলি ফিরিয়ে দিলে ঔরংজেব তাদের ক্ষমা করেন।

এখন জোব চার্নক হুগলি তাদের পক্ষে নিরাপদ নয় বুঝে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুতানুটিতে একটি কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে

সুতানুটির পার্শ্ববর্তী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম দুটিও ইংরেজরা ইজারা নেয়। এইভাবে কলকাতা শহরের সূচনা হয়। কলকাতার দ্রুত উন্নতি হ'তে থাকে। ইংরেজরা সুতানুটির সুরক্ষিত কুঠিকে কেল্লায় পরিণত করে। তখনকার ইংলণ্ডের রাজার নাম অনুসারে কেল্লার নাম হয় ফোর্ট উইলিয়ম।

সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে বিরোধ—পলাশির যুদ্ধ।—ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ভারতেও তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেতো। তাই ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীরা সর্বদা নিজেদের শক্তিশালী ক'রে তুলতে সচেষ্ট ছিল। ঐ সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ায় স্থানীয় শাসকদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বাধতো। এই বিবাদ ও যুদ্ধের সুযোগে ফরাসী ও ইংরেজরা বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়ে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করতো। কর্ণাটকে ও হায়দরাবাদে সিংহাসনের দাবীদারদের মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ বাধলে ইংরেজ ও ফরাসীরা তাতে অংশ নেয়। ইংরেজদের সমর্থিত দাবীদার জয়ী হওয়ায় দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ইংরেজরা ফরাসীদের চন্দননগর কুঠি দখল ক'রে নিলো।

সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের এই আচরণ পছন্দ করলেন না। তিনি জানতেন, ইংরেজরা এইরকম যুদ্ধের সূত্রেই দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। অন্য কারণেও তিনি ইংরেজদের উপর বিরক্ত হয়েছিলেন। **রাজবল্লভ** ছিলেন ঘসেটি বেগমের দেওয়ান। তিনি ভিতরে ভিতরে সিরাজের বিরোধিতা করছিলেন। তাঁর পুত্র **কৃষ্ণদাসকে** সিরাজ তহবিল তছরুপের অভিযোগে অভিযুক্ত করলে কৃষ্ণদাস কলকাতায় পালিয়ে যান এবং ইংরেজরা তাঁকে আশ্রয় দেয়। ইংরেজরা কলকাতায় নূতন ক'রে দুর্গও নির্মাণ করতে থাকে। সিরাজ তাদের জানিয়ে দেন যে, তারা শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করতে পারে, কিন্তু দুর্গ নির্মাণ করতে পাবে না।

ঘসেটি বেগম যাতে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে না পারেন, সেজন্য

সিরাজ তাঁকে মুর্শিদাবাদে নিজের প্রাসাদে এনে রেখেছিলেন। সিরাজ সংবাদ পেলেন, পূর্ণিয়ায় তাঁর মাসতুতো ভাই **সওকত জঙ্গ** তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন। সিরাজ অবিলম্বে সসৈন্যে পূর্ণিয়া রওনা হলেন। কিন্তু পথে তিনি ইংরেজ গভর্নর **ড্রেকের** কাছ থেকে এই মর্মে পত্র পেলেন যে, তারা দুর্গ নির্মাণ বন্ধ রাখবে না। ইংরেজদের এই ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হয়ে সিরাজ কাশিমবাজারে ইংরেজদের কুঠি লুঠ ক'রে দ্রুত কলকাতা যাত্রা করলেন এবং কলকাতা অধিকার ক'রে নিলেন। ইংরেজরা কলকাতা ছেড়ে ফলতায় পালিয়ে গেল। সিরাজ পূর্ণিয়া অভিযান ক'রে সওকত জঙ্গকে পরাজিত ও হত্যা করলেন।

সওকত জঙ্গের মৃত্যু হ'লে এখন আলিবর্দীর ভগ্নিপতি ও সিরাজের প্রধান সেনাপতি **মীরজাফরকে** কেন্দ্র ক'রে চক্রান্ত চলতে লাগলো। কলকাতার বিখ্যাত ধনী **উমিচাঁদ**, বাংলার বিখ্যাত ধনী ও পোদ্দার **জগৎশেঠ, রাজবল্লভ** প্রভৃতি ব্যক্তিরাই এই চক্রান্তে উদ্‌যোগী ছিলেন। ইংরেজরা এই চক্রান্তে যোগ দিলো। শীঘ্র ইংরেজবাহিনী **রবার্ট ক্লাইভ** ও নৌ-সেনাপতি **ওয়াট্‌সনের** অধীনে এসে পৌঁছলো। ক্লাইভ কলকাতা অধিকার ক'রে হুগলি লুণ্ঠন করলেন। তারপর বৃটিশ বাহিনী রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হ'লো। চক্রান্তের ফলে নবাবের সৈন্যরা পথে তাদের বাধা দিলো না। শেষে নদীয়ার গঙ্গাতীরে **পলাশির** আমবনে ইংরেজ ও নবাবের বাহিনী মুখোমুখি হ'লো। **মীরমদন, মোহনলাল** প্রভৃতি বিশ্বস্ত সেনাপতির বীরত্বে নবাবের জয় যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন সিরাজ মীরজাফরের পরামর্শে যুদ্ধ স্থগিত রাখলেন। এই সুযোগে বৃটিশ বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে নবাবের বাহিনীকে পরাজিত করলো। এইভাবে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা হারালো।

সিরাজ পলায়ন করেছিলেন। তাঁকে বন্দী ক'রে অশেষ লাঞ্ছনার পর হত্যা করা হ'লো। সিরাজ ছিলেন আঠারো উনিশ বছরের তরুণ। প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে তিনি যে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তিনি মাত্র চৌদ্দ মাস নবাবি করেছিলেন।

অনুশীলনী

১। ইউরোপীয় বণিকদের আগমন সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। ইংরেজ-মুঘল দ্বন্দ্ব ও কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠার বিবরণ দাও।

৩। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ ও পলাশির যুদ্ধের বিবরণ দাও।

৪। টীকা লিখ: কলকাতার প্রতিষ্ঠা; পলাশির যুদ্ধ।

কালরেখা

আঃ ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ—	বক্তিয়ার খলজির নদীয়া জয়
১৩৩৯ „ —	স্বাধীন সুলতানির সূচনা
১৩৪৩-৫৩ „ —	ইলিয়াস শাহ্
১৩৯৩-১৪১০ „ —	আজম শাহ্
১৪১৪-১৮ „ —	রাজা গণেশ
১৪৮৬ „ —	চৈতন্যদেবের জন্ম
১৪৯৩-১৫১৯ „ —	হুসেন শাহ্
১৪৯৮ „ —	নূতন জলপথ আবিষ্কার
১৫১৯-৩২ „ —	নসরৎ শাহ্
১৫২৬ „ —	মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
১৫৩৮ „ —	শের শাহের বাংলা জয়
১৫৪৫ „ —	শের শাহের মৃত্যু
১৫৫৬ „ —	আকবরের রাজ্য লাভ
১৫৭১ „ —	দাউদ খাঁর মৃত্যু
১৫৯৯ „ —	ইশা খাঁর মৃত্যু
১৬০৩ „ —	কেদার রায়ের মৃত্যু
১৬০৬ „ —	প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু
১৭০৭ „ —	ঔরংজেবের মৃত্যু
১৭২৭ „ —	মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যু
১৭৪০ „ —	আলিবর্দীর নবাবি লাভ
১৭৫৬ „ —	আলিবর্দীর মৃত্যু
১৭৫৭ „ —	পলাশির যুদ্ধ

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলায় বৃটিশের শক্তিবৃদ্ধি—ক্লাইভ, মীরজাফর—কোম্পানির দেওয়ানি লাভ—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বাংলায় ইংরেজের শক্তিবৃদ্ধি।—পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে ইংরেজরা মীরজাফরকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব করলো। রবার্ট ক্লাইভ ও তাঁর সঙ্গীদের মীরজাফর প্রচুর অর্থ দিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়া হ'লো প্রচুর অর্থ ও চব্বিশ পরগনার জমিদারি। কিন্তু ইংরেজরা তাতেও সন্তুষ্ট হ'লো না। তারা মীরজাফরের কাছ থেকে ক্রমাগত আরো টাকা দাবি করতে লাগলো। মীরজাফর অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এবং ইংরেজদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টায় চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কন্তু ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদেড়ার যুদ্ধে ওলন্দাজরা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হওয়ায় তিনি হতাশ হলেন। এই সময়ে ক্লাইভ ইংলণ্ডে গেলেন। কলকাতার গভর্নর হলেন **ভ্যান্‌সিটার্ট** সাহেব। তিনি মীরজাফরের কাছে প্রচুর টাকা দাবি করলেন। মীরজাফর টাকা দিতে না পারায় ইংরেজরা মীরজাফরকে পদচ্যুত ক'রে তাঁর জামাতা **মীরকাশেমকে** নবাব করলো।



মীরজাফর

মীরকাশেম নবাব হয়ে কোম্পানির গভর্নর ও কর্মচারীদের প্রচুর টাকা বকশিশ দিলেন। কোম্পানিকে দিলেন বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি। কিন্তু মীরকাশেম ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি নবাব হয়েই নিজের শক্তিবৃদ্ধি করতে চাইলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে নতুন ক'রে তৈরি করলেন। মুর্শিদাবাদে ইংরেজদের প্রভাব অত্যধিক হওয়ায় তিনি **মুঙ্গেরে** রাজধানী নিয়ে গেলেন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানিকে যেসব সুবিধা দেওয়া

হয়েছিল, কোম্পানির বাইরের ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও সেইসব সুবিধা ভোগ করছিল। এতে দেশীয় ব্যবসায়ীদের খুবই ক্ষতি হচ্ছিল। তাই মীরকাশেম তা নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। এ নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশেমের বিবাধ বাধলো। বিবাদ থেকে যুদ্ধ। ইংরেজরা পর পর কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সুটি, উদয়নালা ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে জয়ী হ'লো। মীরকাশেম মুঙ্গের থেকে পাটনায় এবং পাটনা থেকে অযোধ্যায় পালিয়ে গেলেন। তিনি অযোধ্যার নবাব ও বাদশার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে আবার ইংরেজদের সম্মুখীন হলেন। কিন্তু **বক্সারের** যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে সম্পূর্ণরূপে তাঁর পরাজয় হ'লো (১৭৬৪)। এখন তিনি নিরুপায় হয়ে দিল্লীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এর তেরো বছর বাদে শোচনীয় দৈন্য-দুর্দশার মধ্যে দিল্লীতে তাঁর মৃত্যু হয়।



মীরকাশেম

মীরকাশেমের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হ'লেই ইংরেজরা আবার মীরজাফরকেই সিংহাসনে বসিয়েছিল। কিন্তু এর অল্পদিন বাদেই মীরজাফরের মৃত্যু হ'লো। এখন ইংরেজরা মীরজাফরের পুত্র **নাজমদ্দৌলাকেই** বাংলার নবাব করলো।

ক্লাইভ ইংলণ্ড থেকে ফিরে এলেন। তিনি ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে সতেরো বছর বয়সে কোম্পানির সামান্য কেরানি হয়ে এদেশে এসেছিলেন। তাঁর বুদ্ধি ও বীরত্বে ইংরেজরা দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য ইংলণ্ডের রাজা তাঁকে 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত করলেন। পরে অবশ্য তাঁকে নানাপ্রকার দুর্নীতির দায়ে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং

বিচারে তিনি 'ইংলণ্ডের হিতৈষী' বলে নিষ্কৃতি পেলেও লোকনিন্দায় আত্মহত্যা করেছিলেন। যাই হ'ক, অযোধ্যার নবাব মীরকাশেমের পক্ষে যোগ দেওয়ায় ক্লাইভ তাঁর কাছ থেকে সন্ধির শর্তস্বরূপ নগদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদ ও করা জেলা আদায় করলেন।



লর্ড ক্লাইভ

কোম্পানির দেওয়ানি লাভ।—ক্লাইভ ছিলেন অতিশয় চতুর। ঐ সময়ে দিল্লীর বাদশারা দুর্বল হয়ে পড়লেও লোকে তাঁদেরই ভারতের ন্যায়সঙ্গত অধীশ্বর মনে করতো। ইংরেজরা ছিল বিদেশী। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবিস্তৃত অঞ্চল তাদের করতলগত হ'লেও দেশবাসী তাদের শাসক ব'লে সহজে স্বীকার করবে না, একথা ক্লাইভ জানতেন। তাই তিনি দিল্লীর বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে এলাহাবাদ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে কোম্পানির জন্য বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার **দেওয়ানি** (রাজস্ব আদায়ের অধিকার) নিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে কোম্পানি যাতে জনপ্রিয়তা না হারায় সেই উদ্দেশ্যে ক্লাইভ এদেশের লোকের হাতেই রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায় নামে দুই ব্যক্তিকে কোম্পানি এজন্য নিযুক্ত করলো।

কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের ভার নিলো, কিন্তু দেশ-শাসনের দায়িত্ব নিলো না। দেশ-শাসনের দায়িত্ব রইলো নবাবের উপর। কিন্তু নবাব ছিলেন নামমাত্র নবাব। তাঁকে বছরে ৫৩ লাখ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর হাতে যথেষ্ট অর্থ না থাকায় দেশ-শাসনের দায়িত্ব পালন তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। ফলে দেশে অরাজকতা দেখা দিলো। কোম্পানি ও নবাবের কর্মচারীরা দেশবাসীর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করতে লাগলো। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশার অন্ত রইলো না।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।—ক্লাইভ আবার দেশে চলে গেলেন। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা যখন চরমে পৌঁছেছিল, তখন দেশে দেখা দিলো অনাবৃষ্টি। অনাবৃষ্টির ফলে অজন্মা হ'লো দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। রাজস্ব আদায় বন্ধ করা দূরের কথা, ঐ বৎসর অনেক বেশি পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা হ'লো। মানুষের দুর্গতির সীমা রইলো না। মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় ঘাস-পাতা খেলো, ঘরবাড়ি ছেড়ে পালালো, স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করলো। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে দেখা দিলো মহামারী। বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গেল। কৃষকের অভাবে বহু অঞ্চল বনে-জঙ্গলে ভরে গেল; ঘর-বাড়ি জনশূন্য, লতাগুল্মে পূর্ণ, শৃগাল-কুকুর ও বন্যজন্তুর আবাসস্থল হয়ে উঠলো। বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে) এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তাই একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।


ওয়ারেন্ হেস্টিংস

স্বহস্তে কোম্পানির শাসনভার গ্রহণ।—বাংলাদেশের এই ভয়াবহ অবস্থার কথা ইংলণ্ডে পৌঁছেছিল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে কোম্পানির কাজের তীব্র সমালোচনা করা হ'লো। কোম্পানি তাই বাংলাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়ারেন্ হেস্টিংসকে গভর্নর ক'রে পাঠালো (১৭৭২)। ইংলণ্ডের সরকারও ভারতে শাসনকার্য চালাবার ব্যাপারে কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে আইন পাস করলো। এই আইন অনুসারে হেস্টিংস হলেন গভর্নর-জেনারেল বা বড়লাট। তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি 'কাউন্সিল' রইলো। দেশে সর্বোচ্চ বিচারালয়রূপে রইলো **সুপ্রীম কোর্ট**।

কোম্পানি এখন স্বহস্তে শাসনের দায়িত্ব নিলো। বড়লাট হলেন দেশ-শাসনের সর্বময় কর্তা। হেস্টিংস্ মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে পদচ্যুত-ক'রে রাজস্ব আদায়ের জন্য 'কালেক্টর' নামে একদল ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগ করলেন। যে জমিদার সবচেয়ে বেশি পরিমাণ খাজনা দিতে পারবে, তাকেই তিনি দশ বছরের জন্য জমিদারি বন্দোবস্ত দিলেন। তিনি জেলায় জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করলেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আপীলের জন্য রইলো সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত। এখন মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলকাতাই হ'লো বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা তথা বৃটিশ-অধিকৃত ভারতের রাজধানী।



লর্ড কর্নওয়ালিস

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।— ওয়ারেন্ হেস্টিংসের পর **লর্ড কর্নওয়ালিস্** বড়লাট হয়ে এলেন। তিনি শাসন, বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থায় আরো উন্নতি সাধন করলেন। সর্বাধিক রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে জমিদারি নিয়ে জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে অত্যধিক খাজনা আদায়ের জন্য জুলুম করতো। ফলে প্রজাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। জমিদাররা প্রতিশ্রুত রাজস্ব প্রায়ই দিতে পারতো না। ফলে সরকার ঠিক কতো রাজস্ব পাবেন জানা যেতো না। জমিদারদের জমিতে স্থায়ী স্বত্ব না থাকায় তারা জমিদারির উন্নতির দিকে নজর দিতো না। এইসব অসুবিধা দূর করবার জন্য **লর্ড কর্নওয়ালিস** ওয়ারেন্ হেস্টিংস-প্রবর্তিত রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তন ক'রে জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব সম্পর্কে স্থায়ী বন্দোবস্ত করলেন। এই বন্দোবস্ত **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** নামে পরিচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারদের দেয় রাজস্ব বেঁধে দেওয়া হ'লো। জমিদাররা জমিদারিতে স্থায়ী স্বত্ব পেলো। কেবল নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে খাজনা দিতে না পারলে জমিদারি বাজেয়াপ্ত ক'রে নেওয়ার ব্যবস্থা রইলো।

এই ব্যবস্থায় জমিদাররাই লাভবান্ হ'লো সবচেয়ে বেশি। জমিদাররা পতিত জমি উদ্ধার ক'রে তাদের জমিদারি বাড়ালো সত্য, কিন্তু সরকার সেজন্য অধিক রাজস্ব পেলেন না। সরকার প্রয়োজন হ'লেও রাজস্ব বাড়াতে পারলেন না। এখন করবৃদ্ধি ক'রেই সরকারকে টাকা সংগ্রহ করতে হ'লো। করভার জনসাধারণের উপরই পড়তো। সরকার প্রজাদের দেয় খাজনার পরিমাণ বেঁধে না দেওয়ায় জমিদারদের জুলুমথেকে প্রজারা রক্ষা পেলো না। জমিদারিতে স্থায়ী মালিকানা থাকায় প্রজাদের উপর জমিদারদের অত্যাচার বহুগুণে বৃদ্ধি পেলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে এক নূতন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হ'লো। এরা বৃটিশ সরকারের ঘোর সমর্থক হয়ে উঠলো।

বাংলাদেশের জনসাধারণকে তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, পশ্চিমবঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটেছে।

অনুশীলনী

১। বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজেদের প্রভুত্ব স্থাপনের বিবরণ দাও।

২। কোম্পানির বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। কোম্পানির স্বহস্তে শাসনভার সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি? এর উদ্দেশ্য ও ফলাফল আলোচনা কর।

৬। টীকা লিখ: লর্ড ক্লাইভ; কোম্পানির দেওয়ানি লাভ; মীরকাশেম; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলার নবজন্ম

বাংলায় রেনেসাঁস।—দেশ যখন দীর্ঘকালের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা ছেড়ে যুক্তি, জ্ঞান ও মানবিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তখন তাকে বলা হয় **রেনেসাঁস**। 'রেনেসাঁস' ফরাসী শব্দ, এর মূল অর্থ নবজন্ম। মধ্যযুগে ইউরোপ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতায় পূর্ণ ছিল। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে সেখানে যে যুক্তি, জ্ঞান ও মানবতাবোধের উদ্ভব হয়েছিল, তার ফলে ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, জ্ঞানবিজ্ঞানে এসেছিল এক নবযুগ। জন্ম হয়েছিল শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের, ধর্মসংস্কারকদের, চিন্তাশীল মনীষীদের। এর ফলেই নব নব চিন্তায় ও জ্ঞানে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল ইউরোপ ; ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যায় অধিকার করেছিল শীর্ষস্থান।

বাংলাদেশেও ঐরকম রেনেসাঁস ঘটেছিল। কলকাতা ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের রাজধানী হওয়ায় বাংলাদেশই পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সর্বাগ্রে পরিচিত হয়েছিল। মুঘল আমলের শেষদিকে দেশে যে অরাজকতা ও অশান্তি দেখা দিয়েছিল, তা বাংলাদেশ থেকে দূর হয়েছিল সবার আগে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়ায় বাংলাদেশে এক শ্রেণীর লোকের হাতে এসেছিল প্রচুর অর্থ ও অবসর। এঁরা বা এঁদের সন্তানরা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এঁদের জীবনের প্রচুর অর্থ, জ্ঞানলাভের সুযোগ, অবসর, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আসায় এঁরাই বা এঁদের সন্তানরাই বাংলাদেশে নবযুগের প্রবর্তন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় **রাজা রামমোহন রায়ের**।

রাজা রামমোহন।—রামমোহন রায় এখনকার হুগলী জেলার **রাধানগর** গ্রামে ১৭৭২ বা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এক বিত্তবান্ ব্রাহ্মণ

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রামমোহনের পূর্বপুরুষ নবাবের অধীনে উচ্চপদে চাকরি করায় 'রায়-রায়ান' উপাধি পেয়েছিলেন, তাই রায় পদবিই ব্যবহার করতেন।



রামমোহন

দেশে ইংরেজ শাসন এই সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। তখনও শিক্ষিত সমাজ ও আইন আদালতের ভাষা ছিল আরবী-ফারসী। তাই রামমোহনের পিতা **রামকান্ত রায়** পুত্রকে পাটনায় রেখে আরবী ও ফারসী ভাষায় সুশিক্ষিত ক'রে তুললেন। রামমোহন সংস্কৃত ভাষাতেও পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। তিনি অল্প বয়সে কোরান ও উপনিষদ্ পাঠ ক'রে ঈশ্বর এক ও নিরাকার এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। তিনি হিন্দুদের বহু-দেবদেবী ও মূর্তিপূজার নিন্দা ক'রে একখানি বইও লিখলেন। এ নিয়ে তাঁর বাবার সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। ঐ সময়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং তিব্বতে ভ্রমণ করেন।

কয়েক বৎসর পরে তিনি গৃহে ফিরে আসেন এবং বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে থাকেন। তিনি কলকাতায় এসে তেজারতি কারবার করেন এবং পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের অধীনে ও পরে সরকারের অধীনে দেওয়ানের কাজ করেন। এইভাবে তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি ইংরেজদের সংস্পর্শে আসায় ইংরেজী ভাষাতেও সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে স্থায়িভাবে কলকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন। ঐ সময়ে তিনি ইংরেজী ও বাংলায় উপনিষদ্‌গুলি অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন এবং ইসলাম

ও খ্রীষ্টধর্মের মতোই হিন্দুধর্মেও যে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে এক ও নিরাকার বলা হয়েছে, তা প্রচার করতে থাকেন। ফলে তিনি গোঁড়া হিন্দুদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। তিনি খ্রীষ্টের বাণীগুলিকেও সংকলিত ক'রে প্রচার করেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মের যে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেন, তা গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরিদের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁরাও রামমোহনের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। তিনি মূল বাইবেল পড়ার জন্য হিব্রু ও গ্রীক ভাষাও শেখেন এবং গোঁড়া পাদরিদের মত যে ভ্রান্ত, তা প্রমাণ ক'রে দেখান। পাদরিরা হিন্দুধর্মের নিন্দা করলে তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ক'রে দেখান। তিনি নিজেকে সর্বদাই হিন্দু ব'লে প্রচার করতেন এবং হিন্দুসমাজের রীতি অনুসারে উপবীত ধারণ করতেন। ঐ সময়ে শিক্ষিত যুবকদের খ্রীষ্টান হওয়ার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। রামমোহনের প্রচারের ফলে তাঁরা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হলেন এবং রামমোহনের অনুরাগী হয়ে উঠলেন। এই অনুগামীদের নিয়ে রামমোহন পরে **ব্রাহ্ম সমাজ** প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর মতবাদ **ব্রাহ্ম ধর্ম** নামে পরিচিত হয়।

ঐ সময়ে হিন্দু সমাজে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। সেগুলির মধ্যে জঘন্যতম ছিল **সতীদাহ**। স্বামীর মৃত্যু হ'লে স্বামীর চিতায় বিধবা স্ত্রীকেও পুড়িয়ে মারা হ'তো। এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন প্রবল আন্দোলন শুরু করলে শেষ পর্যন্ত বড়লাট **লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্** সতীদাহ নিষিদ্ধ ক'রে দেন। এজন্য গোঁড়া হিন্দুরা রামমোহনের প্রাণনাশেরও চেষ্টা করে।

রামমোহনের অন্যতম কীর্তি এদেশে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন। তাঁর উৎসাহে, ডেভিড হেয়ার, স্যার এডোয়ার্ড ইস্ট প্রভৃতি ইংরেজদের চেষ্টায় ও ধনী হিন্দুদের দানে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে **হিন্দু কলেজ** (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) স্থাপিত হয়। তিনি নিজ ব্যয়ে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামেও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ব্রিটিশ সরকার ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ অনুসারে কোম্পানি সরকারকে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ

দিয়েছিল। ঐ টাকা যখন সরকার কলকাতায় **সংস্কৃত কলেজ** স্থাপনের জন্য ব্যয় করতে চাইলো, তখন রামমোহন তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বললেন, সংস্কৃত শিক্ষার দ্বারা এদেশের কোনও উন্নতি হবে না, এদেশের মানুষ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে থাকবে। তখন সরকার তাঁর প্রতিবাদে কর্ণপাত না করলেও তাঁর মৃত্যুর দু বছর পরেই বড়লাট **উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্** ও তাঁর আইন-সচিব **বেবিংটন মেকলে** এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে উদ্‌যোগী হন।

এদেশীয় সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারেও রামমোহন ছিলেন অগ্রণী। তাঁর উৎসাহেই তাঁর বন্ধু হরচন্দ্র রায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ করেন। রামমোহন নিজেও **'ব্রাহ্মণ সেবধি', সম্বাদ-কৌমুদী** ও **মিরাত্-উল্-আখবার** নামে বাংলা-ইংরেজী, বাংলা ও ফারসী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ক'রে আইন করলে রামমোহন তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান।

রামমোহন যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাংলা গদ্য ব'লে প্রায় কিছুই ছিল না। অথচ মাতৃভাষার মাধ্যমে ভিন্ন জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তোলা অসম্ভব। তাই রামমোহন তাঁর চিন্তাপূর্ণ নিবন্ধগুলিও বাংলা গদ্যে লিখতে থাকেন। বাংলা গদ্যকে তাঁকে নিজ হাতে গভীর ও চিন্তাপূর্ণ রচনার উপযোগী ক'রে নিতে হয়। এজন্য তাঁকে **বাংলা গদ্যের জনক** বলা হয়। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণও রচনা করেন।

রামমোহন সেযুগের সর্বাধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। কোথাও কোন দেশ পরপদানত হ'লে তাঁর দুঃখের সীমা থাকতো না। আবার কোথাও বিপ্লবীরা বা স্বাধীনতা-যোদ্ধারা জয়ী হ'লে তিনি আনন্দে অধীর হয়ে উঠতেন।

ঐ সময়ে দিল্লীর বাদশাহ্‌রা ইংরেজের বৃত্তিভোগী হয়ে ছিলেন। কোম্পানির সরকার তাঁদের প্রতি নানাভাবে অবিচার করতো। তাই

বাদশাহ্ **দ্বিতীয় আকবর** রামমোহনকে **রাজা** উপাধি দিয়ে তাঁকে ইংলণ্ডের রাজার কাছে তাঁর দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন। সমুদ্রযাত্রা ঐ সময়ে হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ঐ নিষেধ অমান্য ক'রে রামমোহন অসাধারণ দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া, সেযুগে কোন ভারতীয় কেন, কোন এশীয়, এভাবে ইউরোপে যাননি। রামমোহন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বিপুল সম্মান পেয়েছিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কেবল পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ নয়, রাজারাও তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। এই বিপুল সম্মানের মধ্যেই ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলংণ্ডে লিভারপুলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রামমোহন ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভা। ভারতে আধুনিক কালের সূচনা করেছিলেন রামমোহন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে **ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তক** আখ্যা দিয়েছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—রামমোহনের প্রিয় সহচর ছিলেন জোড়াসাঁকোর **দ্বারকানাথ ঠাকুর**। দ্বারকানাথ ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা, স্বাধীনভাবে ব্যবসা, ইংরেজদের অধীনে চাকরি, সরকারী চাকরি এবং জমিদারদের আইন বিষয়ে পরামর্শদাতারূপে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি দুবার ইংলণ্ড যান। ইংলণ্ডে তিনি এমন বিলাস-বৈভবের মধ্যে কাটাতেন যে, লোকে সেখানে তাঁকে 'প্রিন্স' বলতো। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকাল বিলাস-বৈভবের মধ্যেই কাটে। তিনি হিন্দু কলেজে কয়েক বছর পড়েন। ঐ সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে খুবই উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল। ঐ উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁকে স্পর্শ না করলেও ধনীর সন্তান হওয়ায় ঐ সময়ে তাঁর চরিত্র সম্পূর্ণ অনাবিল ছিল না। আঠারো থেকে একুশ বৎসর পর্যন্ত ছিল দেবেন্দ্রনাথের বিলাসিতার



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

জীবন। কিন্তু ঐ সময়ে, তাঁর একুশ বৎসর বয়সে, তাঁর পিতামহীর মৃত্যু ঘটায় তাঁর জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। জ্ঞান-পিপাসায় তিনি অধীর হয়ে ওঠেন। এই সময়ে রামমোহন-অনূদিত উপনিষদের একখানি ছেঁড়াপাতা তাঁর হাতে এসে পড়ে। তার একটি শ্লোক তাঁর মনে গভীরভাবে সাড়া দেয়। তিনি ভোগ-বিলাস ত্যাগ ক'রে সংযত জীবন যাপন শুরু করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স যখন মাত্র বাইশ বছর, তিনি **তত্ত্ববোধিনী সভা** স্থাপন করেন। পর বৎসর তিনি **তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা** স্থাপন ক'রে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও ভারতীয় ধর্মচিন্তা সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি তখনকার সংস্কৃতিসম্পন্ন ও শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মতো ব্যক্তিদের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে থাকে।

ইতিমধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু হ'লে সমস্ত সংসারের দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। এই সময়ে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ট্যাগোর কোম্পানি ফেল পড়ে এবং দেবেন্দ্রনাথ অর্থসংকট ও বিষয় সমস্যায় পড়েন। তিনি কঠোরভাবে ব্যয়-সংকোচ ক'রে আর্থিক সমস্যার সমাধান করেন। তাঁর ত্যাগ, সংযম ও ঈশ্বরচিন্তার জন্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে **মহর্ষি** আখ্যা দেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ যুবক কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে যোগ দেন এবং দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত হয়ে ওঠেন। বহু তরুণ এসে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। কিন্তু তরুণ ব্রাহ্মদের একাংশের সঙ্গে কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ ঘটে। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে এইসব তরুণ ব্রাহ্ম 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পৃথক সমাজ স্থাপন করেন। এখন থেকে দেবেন্দ্রনাথ-পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ **আদি ব্রাহ্ম সমাজ** নামে পরিচিত হয়।

রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম আন্দোলনে ভাটা পড়েছিল। ঐ সময়ে বহু শিক্ষিত হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব নেওয়ায় শিক্ষিত তরুণরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না ক'রে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের গৃহ হয়ে উঠেছিল শিল্প, সংগীত, সাহিত্য ও আধুনিক শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র **সত্যেন্দ্রনাথ** ছিলেন ভারতের প্রথম আই. সি. এস. এবং অষ্টম পুত্র **রবীন্দ্রনাথ** ছিলেন বিশ্বকবি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাশি বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।—সম্ভবত রামমোহনের ঠিক পরবর্তী যুগের সবচেয়ে স্মরণীয় নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা **ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** ছিলেন মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি কলকাতায় একটি সামান্য চাকরি করতেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে **ভগবতী দেবীর** গর্ভে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। ঠাকুরদাস মাত্র ন বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি ক'রে দেন। অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন কাটে। কলকাতায় পড়ার সময়ে রান্না থেকে বাজার করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ তাঁকে সহস্তে করতে হ'তো।



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

তবু সংস্কৃত কলেজে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে **বিদ্যাসাগর** উপাধি পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন এবং পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সরকারী বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের পদে কাজ করেন। বিদ্যাসাগর অল্পদিনের মধ্যে ইংরেজীতেও সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন।

এদেশে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর দান অতুলনীয়। তাঁর উৎসাহেই সরকার এ দেশে ইংরেজী স্কুল, আদর্শ স্কুল, নর্মাল স্কুল প্রভৃতি স্থাপন করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাক্রমের আমূল পরিবর্তন করেন। এখানে ইংরেজী, গণিত ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা তিনিই করেন। তিনিই সংস্কৃত কলেজের দ্বার অব্রাহ্মণদের জন্যও অবারিত করেন। তিনি নিজে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা ক'রে সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজ ক'রে তোলেন। বাংলা ভাষার ও বাংলা শিক্ষার উন্নতির জন্য বাংলা ভাষায় তিনি বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁর রচিত 'বর্ণপরিচয়' আজও শিশুদের পড়ানো হয়। বাংলা গদ্য তাঁর রচনায় সরস ও সুমধুর হয়ে ওঠে। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়েও তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁর উৎসাহেই সরকার এদেশে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হয়। তিনি নিজেও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি মোট ১৫টি বালিকা বিদ্যালয় ও ২০টি আদর্শ বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। হিন্দু কলেজ সাধারণ ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে খুবই ব্যয়সাধ্য ছিল। তাই তিনি নিজে মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ) স্থাপন করেছিলেন।

রামমোহন সতীদাহ নিবারণ করায় বিধবারা প্রাণে বেঁচেছিল। কিন্তু পিতা, ভ্রাতা বা শ্বশুরের পরিবারে তাদের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠতো। বিদ্যাসাগর এই অসহায় অবস্থা থেকে বিধবাদের উদ্ধারের জন্য **বিধবা-বিবাহ আন্দোলন** শুরু করেন। তিনি প্রমাণ ক'রে দেখান, হিন্দু শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। তাঁর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সরকার বিধবা-বিবাহকে বৈধ ব'লে ঘোষণা করে। বিধবা-বিবাহের প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগর বহু অর্থ ব্যয় করেন এবং তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

শিক্ষাবিষয়ে সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে তিনি সরকারী চাকরি ছেড়ে দেন। কিন্তু পুস্তকবিক্রয়, ছাপাখানা প্রভৃতি থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ঐ অর্থ তিনি দীন-দুঃখীর

সেবায় মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন। তাই মহাকবি মাইকেল তাঁকে **দীনের বন্ধু ও করুণাসাগর** ব'লে বর্ণনা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর আর একটি কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তা তাঁর স্বাজাত্যবোধ। তিনি সর্বদাই সাধারণ বাঙ্গালীর মতো মোটা ধুতি, চাদর ও চটিজুতো ব্যবহার করতেন। ঐ পোশাকেই তিনি বাংলার লাট হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গেও দেখা করতেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব একবার তাঁর সঙ্গে অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করলে বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করেছিলেন। তাঁর চরিত্র বজ্রের মতো কঠোর এবং কুসুমের মতই কোমল ছিল।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর পরলোক গমন করেন।

কেশবচন্দ্র সেন।—কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কলুটোলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন দেওয়ান রামকমল সেন। রামকমলের পৈতৃক নিবাস ছিল গরীফা। দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই ধর্মপ্রাণ ও আদর্শবাদী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত এবং অসাধারণ বাগ্মী। তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ বছর বয়সে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তাঁর উৎসাহে ব্রাহ্ম আন্দোলনে প্রবল উদ্দীপনা দেখা দেয়। বহু শিক্ষিত তরুণ ব্রাহ্মসমাজে এসে যোগ দেন। তিনি সারা বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত হয়ে ওঠেন। মহর্ষি তাঁকে **ব্রহ্মানন্দ** আখ্যা দেন।


ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও রীতিনীতিতে বহু পরিবর্তন আনেন। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় স্ত্রীলোকদের যোগদানের অধিকার ছিল না। কেশবচন্দ্র স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে অত্যুৎসাহী ছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম উপাসনায় স্ত্রীলোকদের

যোগদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি বর্ণভেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি বললেন, উপবীত ত্যাগ না ক'রে কোনও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য হ'তে পারবেন না। এ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও প্রবীণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটলো। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন। এর নাম হ'লো **ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ**।

এখন কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা জাতিভেদ, বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতির পক্ষে আন্দোলন চালাতে লাগলেন। কিন্তু শীঘ্রই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের একাংশের মতবিরোধ দেখা দিলো। রামকৃষ্ণ ছিলেন কালীর উপাসক এবং সেই সঙ্গে অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মে বিশ্বাসী। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের অনুরাগী হয়ে উঠলে তাঁর বহু অনুগামী তাতে অসন্তুষ্ট হলেন। কেশবচন্দ্র শেষে যখন কোচবিহারের মহারাজার সঙ্গে নিজের নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন তাঁর বিদ্রোহী অনুগামীরা তাঁকে ত্যাগ ক'রে **সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ** প্রতিষ্ঠা করলেন। কেশবচন্দ্র এখন সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তিনি **নব-বিধান** নামে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

রাজনারায়ণ বসু।—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনার **বোড়াল** গ্রামে রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা **নন্দকিশোর বসু** রামমোহনের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। রাজনারায়ণ কিছুদিন অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। ঐ সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল। তারা হিন্দুধর্মের সকল কিছুকেই কুসংস্কার ব'লে ঘৃণা করতো এবং মদ্যপান, গোমাংশ ভক্ষণ প্রভৃতিকে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা মনে করতো। তারা **ইয়ং বেঙ্গল** বা **নব্যবঙ্গ** নামে পরিচিত ছিল। রাজনারায়ণ ছাত্রজীবনে এই নব্যবঙ্গের প্রভাবে পড়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি অত্যন্ত সংযমী ও মিতাচারী হয়ে ওঠেন এবং **ঋষি রাজনারায়ণ** আখ্যা

পান। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।



রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণের জীবনের প্রধান কথা হ'লো তাঁর তীব্র জাতীয়তাবোধ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গুপ্ত সমিতি স্থাপনের কথা তিনিই প্রথম ভেবেছিলেন। তিনি নবগোপাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথের পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহযোগিতায় **হিন্দুমেলা** স্থাপন করেন। এই মেলায় স্বদেশী জিনিসের উৎকর্ষ প্রদর্শন ক'রে জাতিকে স্বদেশী জিনিস উৎপাদনে ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হ'তো। হিন্দুমেলা দীর্ঘ কয়েক বছর বাঙ্গালীকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। হিন্দুমেলাকে পরবর্তী কালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ঋষি রাজনারায়ণের মৃত্যু ঘটে। **শ্রীঅরবিন্দ** ছিলেন রাজনারায়ণের দৌহিত্র।

রামকৃষ্ণ পরমহংস।—রামকৃষ্ণের পূর্বনাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার **কামারপুকুর** গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে সামান্য মাত্র লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ছ বছর, তখনই তাঁর প্রথম ভাবাবেশ হয়। তিনি বাল্যকাল থেকেই সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিশতে খুব ভালবাসতেন। বয়স বাড়লে তিনি দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দিরে পূজক নিযুক্ত হন। এখন থেকে ধর্মসাধনাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তিনি হিন্দুধর্মের সকল মত ও পথ একে একে অনুশীলন ক'রে দেখেন। খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামও তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেন। সকল

ধর্মই যে এক, তা তিনি ধর্মসাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেন। তিনি কালীর উপাসক ছিলেন, অথচ অদ্বৈতবাদী বা একমাত্র ব্রহ্মেও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেন, সিঁড়ি দিয়ে যেমন উপরে উঠতে হয়, তেমনি দেবদেবীর আরাধনার মধ্যে দিয়েই অদ্বৈত বা ব্রহ্মে পৌঁছান যায়। সুতরাং বহু দেবদেবীর পূজা ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনি বললেন, হিন্দুরা যাকে জল বলে, ইংরেজরা তাকে বলে ওয়াটার, মুসলমানরা বলে পানি। জল, ওয়াটার, পানি একই জিনিস। হিন্দুরা যাকে বলে হরি, ইংরেজরা তাকেই বলে গড, মুসলমানরা বলে আল্লা। হরি, গড ও আল্লা একই ঈশ্বর। বহু ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণের এই বাণী জাতীয় ঐক্যসাধনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন, জীবে দয়া কর। রামকৃষ্ণ বললেন, সর্বজীবে ভগবান আছেন। তবে মানুষ জীবকে দয়া করবার কে? তিনি বললেন, জীবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। জীবের সেবা কর। সেবা ও সকল ধর্ম এক—এই ছিল রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মূলকথা। রামকৃষ্ণ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মানুষের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তার তুলনা নেই। বহু উচ্চশিক্ষিত তরুণ তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁদের অগ্রণী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত—পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সেযুগের বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই তাঁর অনুরাগী ছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণের তিরোধান ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্র।—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার **কাঁঠালপাড়া** গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন

হুগলি কলেজের ছাত্র, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। তিনি পাস করবার পরে সরকারী চাকরিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। তিনি অল্প বয়স থেকেই কবি ঈশ্বরগুপ্তের অনুকরণে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি পরে ইংরেজী ভাষায় উপন্যাস লিখতেও শুরু করেন। কিন্তু পরে বাংলা ভাষাই তাঁর সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রকাশিত হ'লে পাঠক-সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তিনি অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি উপন্যাস রচনা ক'রে বাংলা ভাষায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখকরূপে স্বীকৃতি পান।



বঙ্কিমচন্দ্র

তিনি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করেন। তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তিনি স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীর সম্মুখে ত্যাগ ও সংগ্রামের আদর্শ তুলে ধরেন। ঐ উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম্' গানটি জাতির সমরসংগীতে পরিণত হয়। তিনি তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে' কমলাকান্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম, মানবতা ও সাম্যের বাণী প্রচার করেন। পরবর্তীকালে তাঁর রচনাবলী অরবিন্দ, রাসবিহারী বসু প্রভৃতির মতো অসংখ্য বিপ্লবীকে প্রেরণা দেয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

১। বাংলার নবজন্ম বলতে কি বোঝ? এই যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর নাম কর।

২। রামমোহন রায়কে ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তক বলা হয় কেন? তাঁর জীবনকাহিনী সংক্ষেপে লিখ।

৩। সংক্ষেপে পরিচয় দাও: (ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; (খ) কেশবচন্দ্র সেন; (গ) রাজনারায়ণ বসু; (ঘ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ; (ঙ) বঙ্কিমচন্দ্র।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

বাংলার জাতীয় জাগরণ।—পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙ্গালীরা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের কাহিনী পড়েছিল—পড়েছিল কিভাবে আমেরিকানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে স্বাধীন হয়েছিল, কিভাবে **ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্‌ডি** ও **কাভুরের** নেতৃত্বে ইতালি স্বাধীন হয়েছিল। ঐসব কাহিনী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে জাতীয়তাবাদ জাগিয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পালের মতো ব্যক্তিরাও বাঙ্গালীকে জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত ক'রে তুলেছিলেন।

দেশবাসীর দাবি ইংরেজ সরকারের কাছে তুলে ধরবার জন্য ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের** প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বাঙ্গালী ব্যারিস্টার **উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** হয়েছিলেন এর প্রথম সভাপতি। কংগ্রেসে বাঙ্গালীরাই সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আঠারো বছরের মধ্যে সাত বার বাঙ্গালীরাই হয়েছিলেন এর সভাপতি। ভারতের বিখ্যাত নেতা **গোপালকৃষ্ণ গোখলে** বলেছিলেন, "আজ যা বাঙ্গালী ভাবে, তা কাল ভাবে ভারতবাসী।"

বঙ্গভঙ্গ।—তাই বাঙ্গালী জাতিকে কিভাবে দুর্বল ক'রে দেওয়া যায়, তাই ভাবছিল ইংরেজ সরকার। বাংলাদেশটাকে যদি দুটুকরো ক'রে দেওয়া যায়, তবে বাঙ্গালীরা দুর্বল হয়ে পড়বে। আর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যদি বিবাদ বাধিয়ে দেওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষকে শাসন করারও সুবিধা হবে। বাংলাদেশের পশ্চিম অংশে হিন্দুদের বাস বেশি, আর পূর্ব অংশে মুসলমানদের। বাংলাদেশকে দুটুকরো করলে এবং পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা একটু বেশি দিলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রেষারেষি দেখা দেবে।

তখন বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন। তিনি এই মতলব নিয়ে বাংলাদেশকে দু টুকরো করবার কথা ঘোষণা করলেন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে।



লর্ড কার্জন

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ প্রতিবাদে ও বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত দু বছরে বাংলাদেশে এর প্রতিবাদে দু হাজারেরও বেশি সভা হ'লো। সরকারের কাছে শত শত প্রতিবাদ-পত্র পাঠানো হ'লো। কিন্তু সরকার কিছুতেই কর্ণপাত করলেন না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর থেকে বাংলাদেশকে দু টুকরো করা হ'লো। এখন দুটি রাজ্য গঠন করা হ'লো—বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে একটি এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে অপরটি। এরই নাম **বঙ্গভঙ্গ**।

স্বদেশী আন্দোলন।—কিন্তু বাঙ্গালীরা ইংরেজদের এই অন্যায়কে নীরবে মাথা পেতে নিলো না। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতায় এক বিরাট জনসভা হ'লো। তাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের শপথ নেওয়া হ'লো। ইংরেজরা এদেশে বিলাতী মাল বিক্রি ক'রে কোটি কোটি টাকা লাভ করতো। এ দেশের সব শিল্পকেই ধ্বংস ক'রে এ দেশকে বিলাতী মালের বাজারে পরিণত করেছিল। বিলাতী মাল কেনা বন্ধ করলেই যে ইংরেজদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে তা দেশের নেতারা জানতেন। তাই তাঁরা দেশবাসীকে বিলাতী জিনিস না কিনতে এবং দেশী জিনিস ব্যবহার করতে বললেন। দেশে বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের সাড়া প'ড়ে গেল। এরই নাম **স্বদেশী আন্দোলন**।

সারা দেশে আন্দোলন চালাবার জন্য **ব্রতী সমিতি, সন্তান সম্প্রদায়** প্রভৃতি নামে বহু যুবসঙ্ঘ গড়ে উঠলো। স্বেচ্ছাসেবকেরা দিশি জিনিস ফিরি ক'রে দ্বারে দ্বারে পথে পথে বেড়াতে লাগলো। বিলাতী জিনিস রাশি করে মহানন্দে পুড়িয়ে ফেলা হ'লো। দেশের লোকের চেষ্টায় ছোট ছোট কলকারখানাও গড়ে উঠলো।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, যেদিন বাংলাদেশকে দু টুকরো করা হ'লো, সেদিন সারা বাংলায় হরতাল ও 'অরন্ধন' পালিত হলো। অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা বেরুলো। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে ও রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানে বাংলার আকাশ-বাতাস ভরে গেল। মিলনের প্রতীকরূপে বাঙ্গালী বাঙ্গালীর হাতে হলদে রঙের রাখী বেঁধে দিলো।

বাংলাদেশের এই আন্দোলনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও সাড়া দিলো। বড় লাটের উদ্দেশ্যে আইনসভায় দাঁড়িয়ে মারাঠা নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে বললেন, "বাংলাকে শান্ত করুন।" কিন্তু ইংরেজ সরকার ভ্রূক্ষেপ করলো না। বাংলা আরও অশান্ত হয়ে উঠলো। সরকার আন্দোলনকারীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করলো, নেতাদের গ্রেপ্তার করতে লাগলো। যুবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা বোমা তৈরি ক'রে, পিস্তল বন্দুক যোগাড় ক'রে ইংরেজদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করতে চাইলেন। তাঁদের অনেকে গেলেন জেলে, দ্বীপান্তরে, ফাঁসিতেও প্রাণ দিলেন অনেকে। ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করলো।

বঙ্গভঙ্গ রদ।—এখন পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে একটি প্রদেশ গঠিত হ'লো। তবে আগের সে বাংলা রইলো না। কারণ, সে ছিল আলিবর্দী-সিরাজের সুবে-বাংলা—বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একসঙ্গে। এখন পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলাকে নিয়ে একটি, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে একটি এবং আসাম, এই তিনটি প্রদেশ গঠিত হলো।

কলকাতায় ভারতের রাজধানী ছিল ব'লেই বাঙ্গালীরা এতো অগ্রসর হ'তে পেরেছিলো। ইংরেজ সরকার বাঙ্গালী জাতিকে দুর্বল

ক'রে দেওয়ার জন্য কলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেল দিল্লীতে।

স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা

স্বদেশী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।**

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সুরেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন ডাঃ দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসামান্য কৃতী ছাত্র। তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করলে সরকার তাঁকে স্বল্পকালের জন্য চাকরিতে নিয়োগ ক'রে, সামান্য অজুহাতে বরখাস্ত করলো। সুরেন্দ্রনাথ এই অবিচার নীরবে সহ্য করলেন না। ভারতীয়দের যে রাজকার্যে নিয়োগের ইচ্ছা সরকারের নেই, তা বোঝাবার জন্যে তিনি সারা ভারতে ঘুরে অসংখ্য সভা-সমিতি করলেন। সারা দেশেই শিক্ষিত যুবকরা সরকারের কাছে অনুরূপ ব্যবহার পাচ্ছিলেন। তাঁদের সুরেন্দ্রনাথ ইতালির ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্‌ডি ও ভারতের পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের বীরত্বকাহিনী ও দেশপ্রেমের কথা, এবং ইংরেজদের অন্যায় শাসন ও শোষণের কথা শুনিয়ে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তুললেন। তিনি ১৮৭৬ সালে ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া সরকারের সামনে তুলে ধরবার জন্য **ভারত সভা** স্থাপন করলেন। জাতীয়তাবাদ



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচারের জন্য তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর ইংরেজী সংবাদপত্র **বেঙ্গলী**। এইভাবে সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করলেন। এজন্য তিনি দেশবাসীর কাছে **রাষ্ট্রগুরু** আখ্যা পেয়েছেন।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হ'লে সুরেন্দ্রনাথ হলেন তার অন্যতম প্রধান নেতা। ১৮৯৫ ও ১৯০২ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গ করলেন, তখন তার বিরুদ্ধে সংগ্রামেও তিনি নেতৃত্ব করলেন। ১৯১৭ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পুরোপুরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। পরে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে আপোস ও সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন বাংলা সরকারের মন্ত্রীও হন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আনন্দমোহন বসু ঃ আনন্দমোহন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ কৃতী ছাত্র। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস ক'রে 'র‍্যাংলার' হয়েছিলেন। তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টারি পাস ক'রে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং আইন-ব্যবসায়ে যশস্বী হয়ে ওঠেন।


আনন্দমোহন বসু

কেশবচন্দ্রের তরুণ শিষ্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কেশবচন্দ্র কোচবিহারের মহারাজকুমারের সঙ্গে তাঁর নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিলে তাঁর যে তরুণ শিষ্যরা তাঁকে ত্যাগ ক'রে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আনন্দমোহন ছিলেন তাঁদের নেতা। তিনিই প্রথম তেরো বছর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি ছিলেন।

তাঁকে এদেশে ছাত্র আন্দোলনের জন্মদাতা বলা যায়। তিনিই

ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাবার উদ্দেশে **ছাত্র-সভা** স্থাপন করেন। সুরেন্দ্রনাথ ভারত-সভা স্থাপন করলে তিনি ভারত-সভার সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি একাধারে বিখ্যাত ব্যারিস্টার, সমাজসেবী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন।

যখন বঙ্গভঙ্গ হয়, তখন তিনি রোগশয্যায় শায়িত। তবু তিনি শায়িত অবস্থায় কলিকাতার বিশাল জনসমাবেশে আসেন ও সভাপতিত্ব করেন। তাঁরই রচিত শপথবাণীই সভায় রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে শোনান।

পর বৎসর, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, আনন্দমোহনের মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবীন্দ্রনাথ যা কিছু বিদেশী, তাকে বর্জন করাকে সংকীর্ণতা মনে করতেন। তবু তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত গান 'বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য হোক পুণ্য হোক হে ভগবান।' স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে লিখলেন, 'ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি কিনব না।' তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে বঙ্গভঙ্গের দিন শোক ও ঐক্যের প্রকাশরূপে 'অরন্ধন' ও রাখীবন্ধন পালিত হ'লো। তিনি সভা-সমিতি ও মিছিলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র সকলের হাতেই মিলনের রাখী বেঁধে দিলেন। ঐ সময়ে তাঁর রচনা দেশবাসীকে যেভাবে জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, তার তুলনা হয় না।

অরবিন্দ ঘোষ ঃ অরবিন্দ ঘোষ সাধক ও দার্শনিকরূপেই অমর হয়েছেন পরিচিত হয়েছেন **শ্রীঅরবিন্দ** নামে। কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বিপ্লবী এবং বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অরবিন্দের জন্ম হয়। দেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসু তাঁর মাতামহ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন পদস্থ সরকারী ডাক্তার, সিভিল সার্জন। কৃষ্ণধন ছিলেন

ইংরেজঘেঁষা সমাজের লোক। তাই তিনি পুত্রকে ইংরেজ সমাজের উপযুক্ত ক'রে তোলার জন্য শৈশবেই দার্জিলিংয়ে মিশনারী বিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন এবং মাত্র সাত বছর বয়সেই পাঠিয়েছিলেন বিলাতে।


অরবিন্দ ঘোষ

অরবিন্দের বাল্য ও প্রথম যৌবন বিলাতেই কেটেছিল। তিনি গ্রীক, লাতিন ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছানুসারে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঘোড়ায় চড়তে না পারায় ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারেন নি। ঘোড়ায় চড়তে না পারাটা অজুহাত মাত্র ছিল—আসলে তাঁর রাজনৈতিক মতামতের জন্যই তাঁকে আই. সি. এস.-এ নেওয়া হয় নি। ইংরেজের অধীনে চাকরি করতে অরবিন্দের নিজেরও অনিচ্ছা ছিল। তিনি সাহিত্য বিষয়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস্' পেয়ে সসম্মানে পাস করলেন এবং বরোদার রাজকলেজে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে দেশে চলে এলেন।

বরোদায় থাকার সময়ে তিনি বাংলা ভাষা শেখেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা, বিশেষ ক'রে 'আনন্দমঠ', তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনি মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শে আসেন এবং বাংলাদেশেও ঐরকম গুপ্ত সমিতি গঠনের কাজে মন দেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হ'লে বরোদার রাজকলেজের কাজ ছেড়ে তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন।

দেশের অন্যান্য নেতারা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকে স্বায়ত্তশাসন বা **স্বরাজ** দাবি করছিলেন। অরবিন্দই প্রথম নেতা যিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুললেন। তাই ইংরেজরা তাঁকে গোড়া থেকেই তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ব'লে গণ্য করলো।

ঐ সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল **বন্দেমাতরম্** নামে তাঁর ইংরেজী

কাগজ বার করেছিলেন। অরবিন্দ তার সম্পাদক হলেন। রচনায় ও বক্তৃতায় তিনি দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তুললেন। সরকার বন্দেমাতরম্ কাগজে তাঁর লেখা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করলো। ঐ সময়ে কাগজে সম্পাদকের নাম থাকতো না। তাই লেখাটা যে অরবিন্দের তা প্রমাণ করার জন্য সরকার কাগজের মালিক বিপিনচন্দ্রকে সাক্ষী মানলো। বিপিনচন্দ্র আদালতে এ সম্পর্কে কিছু বলতে রাজী হলেন না। তাই আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর জেল হ'লো। কিন্তু অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

ঐ সময়ে দেশে অনেক গুপ্ত সমিতি ও সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে উঠেছিল। পুলিশ কলকাতা মানিকতলার মুরারিপুকুর রোডে একটি বাগান বাড়িতে বোমা তৈরির কারখানা এবং কিছু আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করলো। ঐ বাগান বাড়ির মালিক ছিলেন অরবিন্দ। তাই অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হ'লো এবং তাঁকেই প্রধান আসামী ক'রে পুলিশ মামলা করলো। এই মামলা **আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা** নামে কুখ্যাত হয়েছে। চিত্তরঞ্জন তখন তরুণ ব্যারিস্টার। তিনি অপূর্ব কৌশলে অরবিন্দকে আদালতে নির্দোষ প্রমাণ ক'রে কারামুক্ত করলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ আবার পূর্ণোদ্যমে রাজনীতিতে নামলেন। কিন্তু সরকার আবার তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলো। অরবিন্দ এই সংবাদ পেয়ে গোপনে চন্দননগরে চ'লে গেলেন। চন্দননগর ছিল তখন ফরাসীদের অধিকারে, তাই নিরাপদ। তারপর গোপনে তিনি চন্দননগর থেকে চলে গেলেন দক্ষিণ ভারতে ফরাসী-অধিকৃত পণ্ডিচেরিতে।

পণ্ডিচেরিতে এসে তিনি রাজনীতি ত্যাগ করেন। এখন ধর্ম-সাধনাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। রাজনীতি ত্যাগ করার পর তিনি প্রায় চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল : বঙ্গভঙ্গের সময়ে অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে তাঁর জন্ম হয়। ঐ যুগের বহু উচ্চশিক্ষিত তরুণের মতোই তিনিও ছিলেন ব্রাহ্ম। তিনি গণিতের জন্য এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল করলেও ইংরেজীতে তাঁর দখল ছিল অসামান্য। তাঁর বাগ্মিতাও ছিল অসাধারণ। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বৃত্তি নিয়ে পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলির স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঐ সময়ে কংগ্রেস সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের নীতিই অনুসরণ করতো। তিনি মারাঠা নেতা **লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক** ও পাঞ্জাবী নেতা **লালা লজপত রায়ের** সঙ্গে মিলিত হয়ে কংগ্রেসকে সংগ্রামের পথে আনতে সচেষ্ট হলেন। তাই তাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে **লাল-বাল-পাল** নামে পরিচিত হয়েছেন।



বিপিনচন্দ্র পাল

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিপিনচন্দ্র দেশব্যাপী প্রচার শুরু করেন। তিনি **বন্দেমাতরম্** নামে ইংরেজী কাগজ প্রকাশ করেন। ঐ কাগজের সম্পাদক হন অরবিন্দ। অরবিন্দকে রাজদ্রোহের অভিযোগ থেকে রক্ষা করবার জন্য বিপিনচন্দ্র নিজে কারাবরণ করেছিলেন।

বিপিনচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ : ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পটুয়াটোলা লেনে চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ভুবনমোহন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন। চিত্তরঞ্জন উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান এবং আই. সি. এস. পরীক্ষা দেন। এই সময় একজন ইংরেজ এম. পি. ভারতবাসীদের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করলে বিলাতে চিত্তরঞ্জন তার

তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁর এই প্রতিবাদ খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ঐ সময়ে ভারতীয় দাদাভাই নওরোজী ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়ার জন্য সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর নির্বাচনী অভিযানে অংশ নেন। এইসব কারণে আই. সি. এস. পরীক্ষায় তাঁকে ফেল করিয়ে দেওয়া হয়। চিত্তরঞ্জন তখন ব্যারিস্টারি পাস ক'রে দেশে ফিরে আসেন। তিনি কলকাতায় ও মফঃস্বলে প্র্যাক্‌টিশ ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করেন।


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হ'লে তিনি আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ প্রভৃতির মতোই ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন ক'রে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে মামলা চালান। এই সময় সংসার চালাবার জন্য তাঁকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ করতে হয়, এমন কি নিজের ঘোড়ার গাড়িটিও বিক্রি ক'রে ফেলতে হয়। মামলায় শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হন এবং অরবিন্দকে মুক্ত করেন। এই মামলায় চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। অল্পকালের মধ্যে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন।

১৯১৭ সালে তিনি পুরোপুরি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং বাংলাদেশের প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশে **অসহযোগ আন্দোলন** শুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলনে ইংরেজের চাকরি, আইন-আদালত, খেতাব, আইনসভা ও স্কুল-কলেজ ছাড়তে বলা হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন ঐ সময় ব্যারিস্টারি ক'রে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার করলেও চিরদিনের জন্য ব্যারিস্টারি ছেড়ে দেন। তিনি নিজের যথাসর্বস্ব দেশের জন্য দান

করেন। তাঁর বিশাল বাসভবনটিও তিনি দেশবাসীর জন্য দান করেছিলেন। ঐ বাসভবনেই পরে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও ক্যানসার হাসপাতাল' স্থাপিত হয়েছে। দেশবাসী তাঁকে **দেশবন্ধু** আখ্যা দেয়। দেশবন্ধুর ডাকে বাংলার লক্ষ লক্ষ তরুণ আন্দোলনে যোগ দেন। এই তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই আন্দোলনে দেশবন্ধু কারারুদ্ধ হন।

চিত্তরঞ্জন যখন জেলে ছিলেন, তখন উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় জনতা একটি থানা পুড়িয়ে দেয় ও কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে। আন্দোলন হিংসার পথে যাচ্ছে ব'লে গান্ধীজী হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করেন। গান্ধীজীর সঙ্গে এ নিয়ে চিত্তরঞ্জনের মতবিরোধ হয়। চিত্তরঞ্জন জেল থেকে বেরিয়ে জওহরলাল নেহেরুর পিতা **মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে স্বরাজ্য দল** গঠন করেন। তিনি হন ঐ দলের সভাপতি ও মতিলাল সম্পাদক। শেষ পর্যন্ত ঐ দলই কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করে।

স্বরাজ্য দল আইনসভা বর্জন না ক'রে আইনসভায় ঢুকে সরকারের কাজে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। চিত্তরঞ্জনের দল কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনেও জয়ী হয়। চিত্তরঞ্জন মেয়র নির্বাচিত হন। এইভাবেই কলকাতা কর্পোরেশনকে তিনিই ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করেন।

চিত্তরঞ্জন যখন বাংলাদেশের মুকুটহীন সম্রাট, তখন ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, হঠাৎ দার্জিলিংয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অনুশীলনী

১। ইংরেজ সরকার কেন বঙ্গভঙ্গ করেছিল?

২। স্বদেশী আন্দোলন কেন হয়েছিল?

৩। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখ: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; আনন্দমোহন বসু; অরবিন্দ ঘোষ; বিপিনচন্দ্র পাল; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বাংলার বিপ্লবীরা

সশস্ত্র সংগ্রামের চেষ্টা।—বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েছিল। সরকার যতোই অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়েছিল, বাংলাদেশের তরুণরা ততোই সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। দেশে বহু **গুপ্ত সমিতি ও গুপ্ত দল** গঠিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে **যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি** প্রধান। শক্তির চর্চা এবং ইংরেজ হত্যা ও এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নই ছিল এইসব গুপ্ত সমিতির লক্ষ্য। এঁরা শাসকদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। তাই এঁরা **সন্ত্রাসবাদী** নামেও পরিচিত। একদিকে যখন অহিংসার পথে স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল, তখন তারই পাশাপাশি চলছিল সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা। রাজনীতিতে এসেছিল বোমা, পিস্তল, বন্দুক। ১৯০৬ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ছিল সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যুগ। এই যুগে অসংখ্য তরুণ দেশপ্রেমিক প্রাণ দিয়েছেন, কঠোর কারাদণ্ড ও নির্বাসন ভোগ করেছেন। অনেককে চিরতরে দেশত্যাগ করতেও হয়েছে। এখানে তাঁদের কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া হলো :

ক্ষুদিরাম বসু।—ক্ষুদিরাম বসু ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর শহরের কাছে হাবিবপুর গ্রামে (মতান্তরে, কেশপুর থানার মোহবনী গ্রামে) জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা ত্রৈলোক্যনাথ বসু নাড়াজোল জমিদারি-সেরেস্তায় কাজ করতেন। ক্ষুদিরামের বয়স যখন ছ-সাত বছর, তখন ক্ষুদিরামের বাবা ও মা অল্প সময়ের ব্যবধানে মারা যান। ক্ষুদিরাম তখন দাশপুর থানায় হাইগাছিয়া গ্রামে তাঁর বড়দিদির কাছে এসে থাকেন। তারপর তিনি কিছুদিন তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে ও মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন। ঐ সময়ে মেদিনীপুরের বিপ্লবী তরুণ **সত্যেন্দ্রনাথ বসুর** সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন

যুগান্তর সমিতির সদস্য। তিনি মেদিনীপুরে একটি তাঁতশালা খুলে বসেছিলেন। আসলে ওটি ছিল বিপ্লবী সংগ্রহের কেন্দ্র। ক্ষুদিরাম এখন থেকে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে ওখানেই থাকলেন ও বিপ্লবী দলে কাজ করতে লাগলেন।



ক্ষুদিরাম বসু

ঐ সময়ে কিংস্‌ফোর্ড নামে এক সাহেব ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। কিংস্‌ফোর্ড আন্দোলনকারীদের অত্যন্ত কঠোর দণ্ড দিতেন। তাই বিপ্লবীরা কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। একটি পার্শেলে ক'রে বোমা পাঠানো হ'লো কিংস্‌ফোর্ডের কাছে। কিংস্‌ফোর্ডের চাপরাশি পার্শেলটি খুলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে মারা গেল। কিংস্‌ফোর্ড ভয় পেয়ে কলকাতা ছেড়ে বিহারের মজফ্‌ফরপুরে চলে গেলেন। তখন ক্ষুদিরাম ও **প্রফুল্ল চাকীর** ওপর ভার পড়লো কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজফ্‌ফরপুর এলেন। একদিন তাঁরা সন্ধ্যায় কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ির মতো একটি গাড়ি আসতে দেখে তার ওপর বোমা ফেললেন। কিন্তু গাড়িতে ছিলেন **মিসেস কেনেডি ও মিস্ কেনেডি** নামে দুই মহিলা। তাঁরাই মারা গেলেন।

পরদিন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য প্রফুল্ল পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করলেন। ঐদিনই দুপুরে চব্বিশ মাইল দূরে একটি রেল স্টেশনে ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হ'লো। তাঁর ফাঁসি হয় ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট।

রাসবিহারী বসু।—রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারীর বাড়ি ছিল বর্ধমানে। তিনি ছিলেন সরকারী কর্মচারী, থাকতেন সিমলায়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার পালারা-বিঘাটি গ্রামে রাসবিহারীর

জন্ম হয়। শৈশবেই রাসবিহারীর মা মারা যান। তখন তিনি মাসীর কাছে মানুষ হন। রাসবিহারীর বয়স যখন পাঁচ-ছ বছর, তখন বিনোদবিহারী চন্দননগরে বাড়ি ক'রে বাস করতে থাকেন।



রাসবিহারী বসু

চন্দননগর ছিল ফরাসী অধিকারে, বৃটিশ-পুলিশের নাগালের বাইরে। তাই বিপ্লবীদের ঘাঁটি ছিল এখানে। রাসবিহারী প্রথম যৌবনেই এখানে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন। তাঁর বাবা তাঁকে দেরাদুনে সরকারের বনবিভাগে একটি চাকরি জুটিয়ে দেন। রাসবিহারী ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমান। অল্পকালের মধ্যেই তিনি সাহেবদের মনোরঞ্জন ক'রে ঐ অফিসের 'বড়বাবু' হন। এই উচ্চপদের আড়ালে থেকে তিনি উত্তর ভারতে বিপ্লবী সংগঠন গ'ড়ে তোলেন।

বঙ্গভঙ্গ রদের পর কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হ'লো দিল্লীতে। ১৯১২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনে নূতন রাজধানীর উদ্বোধন উপলক্ষে বড়লাট লর্ড হার্ডিং শোভাযাত্রা ক'রে দিল্লী প্রবেশ করলেন। রাসবিহারী ও তাঁর সহযোগীরা শোভাযাত্রায় বড়লাটের সুসজ্জিত হাতি লক্ষ্য ক'রে বোমা ফেললেন। বোমার আঘাতে মাহুত মারা গেল, কিন্তু হার্ডিং বেঁচে গেলেন। রাসবিহারীর সহযোগীরা ধরা পড়লেন, তাঁদের ফাঁসি হ'লো। রাসবিহারী উচ্চ সরকারী পদে থাকায় তাঁকে পুলিশ সন্দেহ করলো না। বড়লাটকে হত্যার চেষ্টার নিন্দা ক'রে তিনি সভা-সমিতিও করলেন।

এর দেড় বছর বাদেই বাধলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংলণ্ড ও জার্মানি পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। জার্মানি থেকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাবে, এমন সম্ভাবনা দেখা গেল। রাসবিহারী এখন সারা উত্তর ভারতে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর

মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য প্রস্তুতি চালালেন। শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থানের দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে গেল।

স্থির হ'লো, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি লাহোর সেনানিবাসেই বিদ্রোহ শুরু করা হবে; রাসবিহারী ও তাঁর সহকারী **গণেশবিষ্ণু পিংলে** বিদ্রোহ পরিচালনা করবেন। কিন্তু বিদ্রোহের আগের দিনই পিংলে লাহোর সেনানিবাসে বোমা সহ ধরা পড়লেন। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। বিচারে পিংলের ফাঁসি হ'লো। রাসবিহারী পালিয়ে গেলেন।

এ ব্যাপারে প্রধান নায়ক যে রাসবিহারী, পুলিশ তা জানতে পারলো। এ-ও জানলো যে, হার্ডিং-হত্যার চেষ্টার নায়কও ছিলেন রাসবিহারী। রাসবিহারীকে জীবিত বা মৃত ধরে দেওয়ার জন্য পুলিশ দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলো।

রাসবিহারী ছিলেন ছদ্মবেশে পটু। তিনি নানা ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতা চ'লে এলেন। কিন্তু বুঝলেন, এখন ভারতে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের জাপান সফরে যাওয়ার কথা ছিল। রাসবিহারী সাজলেন রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় এক প্রৌঢ় জমিদার রাজা পি. এন. টেগোর। তারপর পি. এন. টেগোরের নামে পাসপোর্ট নিয়ে পি. এন. টেগোরের ছদ্মবেশে জাপানে পাড়ি দিলেন।

এই যুদ্ধে জাপান ইংলণ্ডের পক্ষেই ছিল। তাই জাপানও রাসবিহারীর পক্ষে নিরাপদ ছিল না। কিন্তু রাসবিহারী এমন কয়েকজন জাপানী বন্ধু পেলেন, যাঁরা জীবন বিপন্ন করেও রাসবিহারীকে লুকিয়ে রাখলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাসবিহারী জাপানী ভাষা শিখলেন, জাপানী মহিলাকে বিবাহ করলেন এবং জাপানের নাগরিক হলেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁর গেল না।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হ'লো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানির ও জাপানের যুদ্ধ। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেশের পর দেশ জয় ক'রে এগিয়ে চললো। জাপান সরকারের

সাহায্যে রাসবিহারী চলে এলেন শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককে। তিনি সেখানে **ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ** স্থাপন করলেন এবং জাপানের হাতে বন্দী বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে গ'ড়ে তুললেন **আজাদ হিন্দ্ ফৌজ**। এর প্রায় এক বছর বাদে, ১৯৪৩ সালে, ভারত থেকে পালিয়ে এসে পৌঁছলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। রাসবিহারী এখন ভারতের এই সর্বজনপ্রিয় নেতার হাতেই ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তুলে দিলেন।

এর দুবছর পরে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, জাপানে রাসবিহারীর মৃত্যু হয়।

বাঘা যতীন।—এঁর পুরো নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দুঃসাহস ও শারীরিক শক্তির জন্য তিনি 'বাঘা' বিশেষণটি পেয়েছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার কয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। যোদ্ধার আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। তিনি প্রথম যৌবনেই গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শে আসেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের নেতা হয়ে ওঠেন। তিনিও রাসবিহারীর মতোই সরকারী উচ্চপদে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। সাহেবরা তাঁকে এতো বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা তাঁর ওপর গুপ্ত সমিতি ও সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজ-খবর রাখার ভারও দিয়েছিলেন। অথচ পূর্ব-ভারতে বিপ্লবীদলের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন যতীন্দ্রনাথ।



বাঘা যতীন

১৯১০ সালে কলকাতা পুলিশের কুখ্যাত কর্মচারী সামশুল হুদাকে বিপ্লবীরা হত্যা করে। হত্যার অভিযোগে পঞ্চাশজন বিপ্লবীসহ যতীন্দ্রনাথ ধরা পড়েন। তাঁদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, গুপ্তহত্যা, রাজদ্রোহ প্রভৃতির বহু অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু পুলিশ কোন অভিযোগই

প্রমাণ করতে পারে না। ১৯১১ সালে যতীন্দ্রনাথ ছাড়া পান। আবার তিনি বিপ্লবী দল সংগঠনে তৎপর হয়ে উঠলেন।

অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ কিছু দোকান খুললেন। বাইরে এগুলি দোকান, কিন্তু ভেতরে বিপ্লবীদের আড্ডা। এগুলির মধ্যে কলকাতায় **শ্রমজীবী সমবায় ও হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স** এবং বালেশ্বরে **ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম** প্রধান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। জার্মানি ভারতীয় বিপ্লবীদের অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিতে চাইলো। ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়ার জার্মান দূতাবাস থেকে গোপনে জানানো হ'লো, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একটি জাহাজ শীঘ্রই আসবে। স্থির হ'লো, জাহাজটি সুন্দরবনের কাছে রায়মঙ্গলে পৌঁছবে এবং গোপনে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেবে। জাহাজে থাকবে ত্রিশ হাজার রাইফেল, এক লাখ বিশ হাজার কার্তুজ ও এক লাখ টাকা।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে অভ্যুত্থানের একটি পুরোপুরি পরিকল্পনা তৈরি করলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কোন জাহাজ এসে পৌঁছলো না। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কক থেকে খবর এলো, নৌকোয় ক'রে পাঁচ হাজার রাইফেল, সেগুলির কার্তুজ ও এক লাখ টাকা আসছে। যতীন্দ্রনাথ বাটাভিয়ায় খবর পাঠালেন, তাঁদের যে জাহাজ আসার কথা, তা যেন সন্দ্বীপে, কলকাতায় ও বালেশ্বরে অস্ত্র নামাবার ব্যবস্থা করে।

অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরি ক'রে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে চ'লে গেলেন। তিনি সেখানে মহানদীর মোহানার কাছে কাপ্তিগোদায় জাহাজের প্রতীক্ষায় রইলেন।

এদিকে পুলিশ হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স-এ তল্লাসি ক'রে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলো এবং কিছু কাগজপত্র পেলো। বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের নামও জেনে ফেললো।

পুলিশ ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে হানা দিয়ে কাপ্তিগোদার সন্ধান পেলো এবং সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে কাপ্তিগোদায় পৌঁছলো। যতীন্দ্রনাথ তাঁর চারজন সহকর্মীকে নিয়ে বনের মধ্যে পালাচ্ছিলেন, কিন্তু পালাবার পথ নেই দেখে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন।

এই যুদ্ধ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর **বুড়ীবালাম** নদীর তীরে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আহত অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ বন্দী হলেন। বালেশ্বরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হ'লো।

মানবেন্দ্রনাথ রায়।—যতীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান সহযোগী ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। বিপ্লবীদের আত্মগোপনের জন্য ছদ্মনাম নিতে হয়। এটিও ছদ্মনাম। তাঁর প্রকৃত নাম **নরেন্দ্র ভট্টাচার্য**। নরেন্দ্রনাথের বাড়ি চব্বিশ পরগনা। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। নরেন্দ্র কৈশোরেই চাংড়িপোতায় গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন এবং সমিতির অন্যতম প্রধান কর্মী হয়ে ওঠেন। তিনি ইংরেজীতে ও বিদেশী ভাষায় কথাবার্তা বলায় সুপটু ছিলেন। তাই জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য যতীন্দ্রনাথ তাঁকে বাটাভিয়া পাঠান। নরেন্দ্রনাথ **সি. মার্টিন** ছদ্মনামে বাটাভিয়া যান।



মানবেন্দ্রনাথ রায়

ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ভার ছিল **হেল্‌ফেরিক** নামে এক জার্মান সাহেবের ওপর। হেল্‌ফেরিক বললেন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জাহাজ করাচী যাবে। জাহাজ যাতে রায়মঙ্গলে যায়, নরেন্দ্রনাথ তার ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ না আসায় তিনি আবার বাটাভিয়া ছুটলেন। ঐ সময়ে তাঁকে কয়েক মাস বাটাভিয়ায় থাকতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ না আসার কারণ শেষ পর্যন্ত জানা গেল।

মাভারিক নামে একটি জাহাজ আমেরিকা থেকে আসার কথা। সেটি তৈলবাহী জাহাজ। কথা ছিল, **অ্যানি লারসেন** নামে অন্য একটি জাহাজে থাকবে অস্ত্রশস্ত্র। পথে অ্যানি লারসেন থেকে

অস্ত্রশস্ত্র মাভারিকে তুলে দেওয়া হবে এবং মাভারিক তা তেলের মধ্যে লুকিয়ে রায়মঙ্গলে পৌঁছে দেবে। যথাসময়ে মাভারিক আমেরিকা-প্রবাসী কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবীকে নিয়ে পথে অ্যানি লারসেনের জন্য অপেক্ষা করলো। কিছুদিন অপেক্ষা ক'রেও যখন অ্যানি লারসেনের দেখা পাওয়া গেল না,তখন শেষে বাটাভিয়ায় গেল। সেখানে জাহাজ তল্লাসি করা হ'লো, কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেল না। আগেই ভারতীয় বিপ্লবীরা জাহাজ থেকে নেমে গিয়েছিলেন। পথে অ্যানি লারসেন ধরা পড়েছিল এবং আমেরিকা তার অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল।

এখন নরেন্দ্রনাথের ও ভারতীয় বিপ্লবীদের ভারতে আসা খুবই বিপজ্জনক ছিল। তাই হেল্‌ফেরিক তাঁদের আমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। নরেন্দ্রনাথ এখন **হরি সিং** নাম নিয়ে আমেরিকায় পৌঁছলেন। আমেরিকায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। কিছুদিন পরে তিনি ছাড়া পান।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় **লেলিনের** নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব হ'লো এবং রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হ'লো কমিউনিস্ট সরকার। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট বিপ্লবের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মেক্সিকোয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অংশ নেন। মেক্সিকোতে একটি অভ্যুত্থান চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে তিনি রাশিয়ায় পালিয়ে যান। সেখানে তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি লেলিনের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। তাঁকে চীন দেশে ও ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু রুশ কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। তিনি ভারতে চলে আসেন এবং কমিউনিস্ট মতবাদ ত্যাগ ক'রে নিজস্ব দল গঠনের চেষ্টা করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিনয়-বাদল-দীনেশ।—রাসবিহারী, বাঘা যতীন প্রভৃতির অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশ অহিংস আন্দোলনের পথে যাওয়ায় বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদীরা নীরব ছিলেন।

১৯৩০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে যখন সারা দেশে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হ'লো, তখন সরকার আন্দোলন দমনের জন্য ভয়ংকর অত্যাচার শুরু করলো। বাংলার একদল তরুণ আবার সন্ত্রাসের পথ নিলেন।



বিনয়কৃষ্ণ বসু

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে বাংলার পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল **লোম্যান** সাহেব ঢাকায় এলেন। তিনি ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্ট **হডসন** সাহেবের সঙ্গে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলেন। সেখানে মিটফোর্ড কলেজেরই একজন ছাত্র তাঁদের গুলি ক'রে পালালো। হাসপাতালে হডসন বেঁচে উঠলেও লোম্যান মারা গেলেন। কে তাঁদের গুলি করেছিল, জানা গেল। মিটফোর্ড কলেজের ছাত্র **বিনয়কৃষ্ণ বসু**।

বিনয়কৃষ্ণকে ধরবার জন্য সারা দেশে তোলপাড় শুরু হ'লো। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না। লোম্যান হত্যার কয়েক মাস বাদে বিনয় আর এক দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন। এই অভিযানে তাঁর সঙ্গী হলেন **বাদল** (সুধীরকৃষ্ণ) **গুপ্ত** ও **দীনেশ গুপ্ত**। তাঁরা স্থির করলেন, ইংরেজ দুঃশাসনের দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করবেন।



বাদল গুপ্ত

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর দুপুর বেলা তাঁরা তিনজন সাহেবী পোশাক প'রে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে

ঢুকলেন। তাঁদের কেউ সন্দেহ করলো না। তাঁরা ঢুকেই পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল **কর্নেল সিম্‌সনকে** গুলি ক'রে হত্যা করলেন। তারপর গুলি করলেন বিচার-বিভাগের সেক্রেটারি **নেলসন** সাহেবকে। তাঁরা ডাইনে বাঁয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বারান্দা দিয়ে ছুটতে লাগলেন। বাংলা-দেশের প্রধান সেক্রেটারি **টাউনসেণ্ড** সাহেব গুরুতরভাবে আহত হলেন। সারা রাইটার্স বিল্ডিং আতঙ্কে, আর্তনাদে, কোলাহলে ও গুলির শব্দে ফেটে পড়লো। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এসে তাঁদের ঘিরে ফেললো। পালাবার পথ নেই দেখে তাঁরা একটি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বাদল পটাসিয়াম সায়ানাইড নামে সুতীব্র বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। বিনয় ও দীনেশ নিজেদের মাথায় গুলি চালালেন। কিন্তু তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে মরলেন না। কয়েকদিন বাদে হাসপাতালে বিনয়ের মৃত্যু হ'লো। দীনেশকে সারিয়ে তুলে বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'লো। পর বৎসর জুলাই মাসে তাঁর ফাঁসি হয়।



দীনেশ গুপ্ত

এই তিন তরুণ বাঙ্গালী বীর যে দুঃসাহস ও আত্মদানের দৃষ্টান্ত দেখালেন, তার তুলনা নেই।

সূর্য সেন—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।—সূর্য সেনের বাড়ি ছিল চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া গ্রামে। তিনি বহরমপুর কলেজে পড়বার সময়ই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯২১ সালে অহিংস সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হ'লে অনেক বিপ্লবী তরুণের মতো তিনিও এই আন্দোলনে যোগ দেন। ঐ সময়ে চট্টগ্রামে একটি জাতীয়

বিদ্যালয় খোলা হয়। সূর্য সেন তাতে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং **মাস্টারদা** নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করলে সূর্য সেন বিপ্লবী দল গঠন করেন। অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল প্রভৃতি তাঁর সহকর্মী হয়ে ওঠেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবীরা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের টাকা লুট করলে পুলিশ সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান। আবার তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে দু বছর আটকে রাখা হয়। ১৯২৮ সালে তিনি মুক্তি পান।



সূর্য সেন

১৯৩০ সালে যখন দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল, তখন তিনি সারা বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের কথা ভাবেন এবং সেজন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহে তৎপর হন। স্থির হয়, সরকারী অস্ত্রাগারগুলি লুণ্ঠন ক'রে অস্ত্র সংগ্রহ করা হবে। তিনি তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে একটি বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেন। এঁদের কেবল যুদ্ধের কৌশলই শেখানো হয় না, মিলিটারি পোশাকেও সুসজ্জিত করা হয়।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে সূর্য সেন মিলিটারি পোশাকে সজ্জিত তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে প্রথমে চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগারে হানা দেন। এখানে রক্ষীকে গুলিতে হত্যা ক'রে তাঁরা প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করেন। তারপর হানা দেন সামরিক অস্ত্রাগারে। সেখানে তাঁরা প্রহরীকে ও পদস্থ কর্মচারী মেজর ক্যারেলকে হত্যা ক'রে বহু রাইফেল, পিস্তল ও একটি মেসিনগান লুট করেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে গুলিগোলা নিতে ভুলে যান। ইতিমধ্যে ব্যারাক থেকে সৈন্যবাহিনী এসে পড়ে। তখন তাঁরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাহাড়ে পালিয়ে যান। কয়েকদিন বাদে সৈন্যরা তাঁদের **জালালাবাদ** পাহাড়ে ঘিরে ফেলে। দুই দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বিপ্লবীদের

দশজন নিহত ও কয়েকজন আহত হন। কিন্তু সৈন্যদের ৭৪ জন নিহত ও প্রায় দেড়শ জন আহত হয়। সৈন্যরা পিছু হটে গেলে সূর্য সেন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যান।

কিছুদিন পরে পুলিশ সংবাদ পায়, তাঁরা চন্দননগরে আছেন। ফরাসী পুলিশের সাহায্যে কলকাতার পুলিশ তাঁদের ঘিরে ফেলে। দুদলে খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং সূর্য সেন পালিয়ে যান। ইতিমধ্যে তাঁর সহকর্মীরা অনেকেই ধরা পড়েছিলেন। তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

অবশেষে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশ খবর পায়, সূর্য সেন কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে চট্টগ্রামের **গৈরালা** গ্রামে লুকিয়ে আছেন। পুলিশ গুর্খাবাহিনী নিয়ে বাড়ি ঘেরাও করে। দুই পক্ষে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর সূর্য সেন ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

সূর্য সেনের মৃত্যুর সঙ্গেই বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটে।

মাতঙ্গিনী হাজরা।—মাতঙ্গিনী বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অহিংস সত্যাগ্রহী। ১৯৪২ সালে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি জয় করতে করতে ভারতের কাছে এসে পৌঁছলো। ইংরেজদের সঙ্গেই জাপানের যুদ্ধ। ইংরেজরা যদি ভারত ছেড়ে যায়, তবে জাপানের ভারত আক্রমণের কারণ থাকে না। তাই গান্ধীজী ইংরেজদের বললেন, **ভারত ছাড়ো।** ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের সকল প্রধান নেতাকে বন্দী ক'রে আটক রাখলো। নেতাদের



মাতঙ্গিনী হাজরা

বন্দী করার সংবাদে সারা দেশ ক্ষোভে ও রোষে ফেটে পড়লো। শুরু হ'লো—আগস্ট অভ্যুত্থান। বিক্ষুব্ধ মানুষ থানা, আদালত, সরকারী অফিস, ডাকঘর, রেল স্টেশন পুড়িয়ে দিলো, পথঘাট নষ্ট করলো, টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ফেললো। সরকার এই অভ্যুত্থান দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিলো।

পর বৎসর ১৯৪৩ সালে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় এই অভ্যুত্থান প্রচণ্ড রূপ নিলো। ২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুক মহকুমার মানুষ শোভাযাত্রা ক'রে থানা, অফিস-আদালত দখল করতে গেল। তমলুক শহরে অনেকগুলি মিছিল এসেছিল। সেগুলির একটির নেতৃত্ব করছিলেন ৭৩ বৎসর বয়স্কা কৃষক বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা।

মাতঙ্গিনী ছিলেন বালবিধবা। পরে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন ও জেলে যান। তিনি গ্রামাঞ্চলে 'গান্ধীবুড়ী' নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। আগস্ট অভ্যুত্থানেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তিনি যে মিছিলটি পরিচালনা করছিলেন, সেটিকে তমলুক আদালতের পেছনে সৈন্যবাহিনী আটকে দিলো। কিন্তু সৈন্যদের উদ্যত বন্দুক উপেক্ষা ক'রে মাতঙ্গিনী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। সৈন্য-বাহিনী তাঁকে লক্ষ ক'রে গুলি চালালো। গুলিতে আহত হয়েও তিনি এগিয়ে চললেন। শেষে একটি গুলি তাঁর মাথায় লাগলে তাঁর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অনেক বীরাঙ্গনাই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু এই বৃদ্ধা কৃষক রমণীর অহিংস বীরত্বের তুলনা নেই।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার কটক শহরে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থান ছিল চব্বিশ পরগনার **কোদালিয়া** গ্রামে। তাঁর বাবা কটকে ওকালতি করতেন। বাল্যকাল থেকেই সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম প্রবল ছিল। তিনি যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে

পড়তেন, তখন **ওটেন** নামে এক সাহেব অধ্যাপক বাঙ্গালীদের নিন্দা করলে সুভাষচন্দ্র তাঁকে প্রহার করেন। এজন্য তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছুদিনের জন্য বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। পরে তিনি বিলাতে গিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করেন। এই সময়ে চলছিল দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন। তাই সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে সরকারী উচ্চপদ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান ক'রে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রিয়তম শিষ্য ও দক্ষিণহস্ত। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর ছ মাস কারাদণ্ড হয়।


সুভাষচন্দ্র বসু

কারামুক্ত হয়ে তিনি দেশবন্ধুর **ফরওয়ার্ড** কাগজের সহকারী সম্পাদক এবং দেশবন্ধু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হ'লে তিনি কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হন। কিছুদিন পরেই তিনি তিন বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লে তিনি প্রায় দু হাজার স্বেচ্ছাসেবককে সামরিক কায়দায় শিক্ষিত ও সজ্জিত ক'রে তোলেন এবং তিনি হন তার অধিনায়ক। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই তাঁর ও জওহরলাল নেহরুর চেষ্টায় সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলা হয়। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি আবার কারারুদ্ধ হন। বার বার দীর্ঘ কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তিনি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যান। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরলেই আবার তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।

গান্ধীজীর প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা, কিন্তু তাঁর অহিংসার গোঁড়ামি ছিল না। হিংসায় হ'ক, অহিংসায় হ'ক, দেশের পূর্ণ

স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাজাড়া, গান্ধীজীর গোঁড়া ভক্তরা ইংরেজদের প্রতি যে আপোসের মনোভাব পোষণ করতেন, তা তাঁর ছিল না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অবিরাম সংগ্রামকেই তিনি স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ মনে করতেন। তাই গান্ধী-পন্থীদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই মতবিরোধ ঘটতো।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দেও গান্ধীজী ও গান্ধীজীর ভক্তদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আবার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু গান্ধীপন্থীরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে না চাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করলেন এবং **ফরওয়ার্ড ব্লক** নামে একটি দল গঠন ক'রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের কথা প্রচার করতে লাগলেন। তিনি কংগ্রেসের নীতির বিরোধী কাজ করছেন এই অভিযোগ তুলে তাঁকে কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ সকল পদ থেকেই অপসারিত করা হ'লো। ইংরেজরা তাঁকেই সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করতো। তাই তাঁকে স্বগৃহে বন্দী ক'রে রাখলো।

ঐ সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। সুভাষচন্দ্র পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আফগানিস্থান ও রাশিয়ার পথে চ'লে গেলেন জার্মানিতে। ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানি, ইতালি ও জাপানের যুদ্ধ চলছিল। জাপান তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহুদেশ অধিকার করেছিল এবং রাসবিহারী বসু গড়ে তুলেছিলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। তাই নেতাজী ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি থেকে সাবমেরিনে ক'রে চলে এলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। তিনিই হলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক। প্রতিষ্ঠা করলেন বিদেশের ভূমিতে প্রথম স্বাধীন ভারত সরকার—**আজাদ হিন্দ্ সরকার**।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ (স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী) ভারতের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে **মণিপুর** পর্যন্ত অগ্রসর হ'লো। সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের পক্ষে যোগ দেওয়ায় জাপানের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়লো। অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের অভাবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পিছু হঠতে বাধ্য হ'লো। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে

হঠাৎ প্রচার করা হ'লো, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আজও এই ব্যাপার রহস্যাবৃত আছে।

ইংরেজ ও মার্কিন বাহিনীর হাতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হাজার হাজার সৈনিক বন্দী হলেন। ইংরেজ সরকার দিল্লীর লাল কেল্লায় তাঁদের বিচারের ব্যবস্থা করলো। সারা দেশ এই বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো এবং বন্দী সৈনিকদের সমর্থনে এগিয়ে এলো। অবশেষে ইংরেজ সরকার তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হ'লো। তাঁরা দেশবাসীর কাছে দেশভক্ত বীরের সম্মান লাভ করলেন।

অনুশীলনী

১। বাংলায় বিপ্লবীবাদ সম্পর্কে কি জান লিখ এবং কয়েকজন প্রধান বিপ্লবীর নাম কর।

২। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও: রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, মানবেন্দ্রনাথ রায়, মাতঙ্গিনী হাজরা।

৩। বিনয়-বাদল-দীনেশের বীরত্ব কাহিনী লিখ।

৪। সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিবরণ দাও।

৫। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত লিখ।

৬। টীকা লিখ: বুড়িবালামের যুদ্ধ; জালালাবাদের যুদ্ধ; আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিংশ শতাব্দীতে বাংলার পুনরুজ্জীবন

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ এসেছিল, তা বিংশ শতাব্দীতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। এখানে আমরা বাংলার যেসব শ্রেষ্ঠ সন্তানের পরিচয় দেব, তাঁদের সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মেছিলেন। তবে স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর সকলের জীবনের পরিপূর্ণ ফসল বিংশ শতাব্দীতেই উঠেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ।—স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম **নরেন্দ্রনাথ দত্ত**। তিনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে দত্ত

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম **বিশ্বনাথ দত্ত** ও মাতার নাম **ভুবনেশ্বরী দেবী**। বিশ্বনাথ দত্ত প্রখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে বিশ্বনাথের পিতা সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করায় এ পরিবারের সকলেরই সন্ন্যাসীদের প্রতি সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও দুর্বলতা ছিল।



স্বামী বিবেকানন্দ

নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ কলেজে (এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজ) ভর্তি হন। তিনি এখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাস করেন। ঐ সময়ে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটায় সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। আত্মীয়-স্বজনরাও সম্পত্তি নিয়ে মামলা শুরু করে। এই অল্প বয়সেই তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন। তাঁর পক্ষে একটি চাকরি জোটানোও দুষ্কর হয়। তিনি আশৈশব ছিলেন ভাবপ্রবণ এবং কৈশোরে দর্শনের ছাত্র। তাই দার্শনিক চিন্তায় ও চাকরি জোটানোর চেষ্টায় তিনি অশান্ত হয়ে ওঠেন। এই সময়ে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে এসে তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে পথের সন্ধান পান। মেট্রোপলিটন স্কুলে তাঁর সামান্য একটি চাকরিও জোটে। নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য হয়ে ওঠেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যু হ'লে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের অন্যান্য তরুণ শিষ্যদের সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি একাকী ভারত পর্যটনে যান এবং আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করেন।

দরিদ্র মানুষ থেকে রাজা-মহারাজারা অনেকেই তাঁর শিষ্য হন খেতরির মহারাজা হন তাঁর অন্যতম শিষ্য।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে **বিশ্ব ধর্ম-সম্মেলন** হচ্ছিল। পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রতিনিধিরাই তাতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যদের ও খেতরির মহারাজার উৎসাহে ও সাহায্যে তিনি ঐ ধর্ম-সম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য গেলেন। এই সময়েই তিনি **স্বামী বিবেকানন্দ** নাম গ্রহণ করেন।

বহু দুঃখকষ্ট ভোগ ক'রে এবং বহু বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূলতা অতিক্রম ক'রে তিনি বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ পান। তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতা ধর্ম-সম্মেলনে শ্রোতাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। তিনি ধর্ম-সম্মেলনের প্রধানতম আকর্ষণ হয়ে ওঠেন এবং আমেরিকায় তথা বিশ্বে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। ইউরোপেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

অতঃপর তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের বহুস্থান ভ্রমণ ক'রে রামকৃষ্ণের বাণী এবং ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। বহু আমেরিকান ও ইউরোপীয় নরনারী তাঁর শিষ্য হন।

বিবেকানন্দ ছিলেন **অদ্বৈতবাদী** এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বিশ্বাসী। তাঁর কাছে দীন দুঃখী পতিত অস্পৃশ্য ও আর্তের সেবাই ছিল পরম ধর্ম। তিনি বলেছিলেন, "হে ভারত! ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!..." তিনি কেবল নিজেই দেশপ্রেমিক ছিলেন না, তিনি ভারতবাসীর মধ্যেও দেশপ্রেম সঞ্চার করেছিলেন।

তিনি ভারতে ও ভারতের বাইরে নানাস্থানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলী জেলার বেলুড়ে তিনি **রামকৃষ্ণ মন্দির ও মঠ** এবং আলমোড়ায় **অদ্বৈত আশ্রম** স্থাপন করেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে, মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভগিনী নিবেদিতা।—ভগিনী নিবেদিতার প্রকৃত নাম **মিস্ মার্গারেট নোবল্**। মিস নোবল্ ছিলেন জাতিতে **আইরিশ**। আয়ারল্যাণ্ড-ও ভারতের মতোই ইংরেজদের পদানত ছিল। তাই আইরিশরা দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। নোবল্ পরিবারও এই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন।



ভগিনী নিবেদিতা

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের ডানগানান শহরে মার্গারেটের জন্ম হয়। তাঁর বাল্যকালেই তাঁর পিতা স্যামুয়েলের মৃত্যু হ'লে নোবল্ পরিবার অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে পড়েন। মার্গারেট আঠারো বছর বয়সে শিক্ষা শেষ ক'রে শিক্ষিকারূপে জীবিকা অর্জন শুরু করেন এবং বাইশ বছর বয়সে ইংলণ্ডে চলে আসেন। এখানে তিনি বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর সংস্পর্শে আসেন। সাহিত্যে, চিত্রশিল্পে, বিজ্ঞানে এবং শিশু-শিক্ষার বিষয়ে তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে এলে তাঁর সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় হয়। স্বামীজীর রচনা ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করে এবং তিনি স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্গারেট ভারতে চলে আসেন এবং ভারতবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে ভালোভাবে জানবার জন্য বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে পর্যটন করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ তাঁকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দেন। এখন তাঁর নাম হয় **নিবেদিতা**। ভারতের নরনারীর কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভগিনী—**ভগিনী নিবেদিতা**।

ভারতীয় নারীদের উন্নতির জন্য নিবেদিতা নানা ভাবে চেষ্টা করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় (এখনকার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়) স্থাপন করেন। তিনি বন্যায়, মহামারীতে ভারতবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও তিনি অংশ নেন। তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেন। ঐ যুগের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁর বন্ধু। ভারতের বিজ্ঞান-সাধনাতেও তাঁর উৎসাহ কম ছিল না। ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

নিবেদিতা একাধিকবার আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ ক'রে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করেন এবং ভারতবাসীর সেবা-কার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। এইভাবে গুরু পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে দার্জিলিং যান। সেখানে হঠাৎ কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ।—কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ও পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের অষ্টম পুত্র এবং জীবিত পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠ।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ সময় ঠাকুর-পরিবার ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সর্বাগ্রণী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ অগ্রজরা সকলেই ছিলেন বাংলার কৃতী সন্তান। এই পরিবেশেই বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন। তিনি বাল্যকালে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে

শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি কিছুদিন বিদ্যালয়েও পড়েন। মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে তিনি তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত যান। সেখানে ব্রাইটন পাবলিক স্কুলে পড়ার পর কিছুদিন লণ্ডনে অধ্যাপক মর্লির কাছেও পড়েন। কিন্তু পাঠক্রম শেষ না ক'রেই দেশে ফিরে আসেন।

অতি বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। মাত্র তেরো বৎসর বয়সে তিনি কবিতা রচনা ক'রে হিন্দু মেলায় পাঠ করেন এবং ঐ কবিতা অমৃতবাজার পত্রিকায় তখন (১৮৭৪) প্রকাশিত হয়। অতঃপর পত্রপত্রিকায় ও গ্রন্থাকারে তাঁর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হ'তে থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রহসনে, প্রবন্ধে—সাহিত্যের সকল শাখায় অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভার জন্য ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। তিনিই সর্বপ্রথম এশিয়াবাসী যিনি ঐ পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হন। সংগীতে, চিত্রকলায়, নাট্যাভিনয়ে, নৃত্যে, সকল বিষয়েই তিনি যুগান্তর আনেন।

কিন্তু তিনি কেবল কল্পনাবিলাসী কবি ও শিল্পী ছিলেন না। দেশের সকল সমস্যা সম্পর্কেই তিনি ছিলেন সচেতন। এই সকল সমস্যার কথা তিনি তাঁর রচনার মধ্যে যেমন তুলে ধরেন, তেমনি কার্যত সমাধানেরও চেষ্টা করেন। অশিক্ষাই ছিল জাতির উন্নতির পথে প্রধান বাধা। সরকার-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতির মানসিক বিকাশের অনুকূল ছিল না। তাই তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূমের বোলপুরে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্থানটিই **শান্তিনিকেতন** নামে পরিচিত। পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এটিই **বিশ্বভারতীতে** পরিণত হয়। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তাই তিনি **গুরুদেব** ও **কবিগুরু** নামেও পরিচিত। এ দেশীয় কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সুরুলে **শ্রীনিকেতন** নামে গ্রামোদ্যোগ কেন্দ্র স্থাপন করেন।

দেশের পরাধীনতা তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিতো। তাঁর সুগভীর দেশপ্রেম তাঁর অসংখ্য কবিতায়, গানে, নাটকে, গল্পে ও প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গভঙ্গের যুগে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে কিভাবে অংশ নিয়েছিলেন, তা আগেই বলা হয়েছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজরা বৈশাখী পূর্ণিমার মেলায় সমবেত অসংখ্য নরনারী ও শিশুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ঘৃণার সঙ্গে ইংরেজ-প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন। রাজবন্দীদের উপর ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ সর্বদাই ধ্বনিত হ'তো।

কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনরূপ সংকীর্ণতা ছিল না। বিশ্বের সকল দেশকেই তিনি আপন দেশ মনে করতেন। তাঁর **বিশ্বকবি** আখ্যা মিথ্যা ছিল না। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ দেশেই তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। সকল দেশেই তিনি বিপুল সম্মান লাভ করেছিলেন এবং ভারতের জন্য মর্যাদার আসন গ'ড়ে তুলেছিলেন।

ভারতের ও বিশ্বের যা কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ, তা তাঁর জীবনে ও রচনায় প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি ছিলেন সর্বদেশের ও সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁর মতো বহুমুখী প্রতিভা মানবজাতির ইতিহাসে বিরল। তিনি যে বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

স্যার আশুতোষ।—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার মলঙ্গা লেনে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা **গঙ্গাপ্রসাদ** মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক। আশুতোষ বাল্যকাল থেকেই অতিশয় তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গণিতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে এম. এ. পাস করেন। গণিতে তিনি এতই সুপণ্ডিত ছিলেন যে, তিনি ছাত্রজীবনেই গণিতের বহু সমস্যা সমাধান ক'রে ইংলণ্ডের পত্রপত্রিকায় পাঠাতেন এবং সেগুলি প্রশংসার সঙ্গেই প্রকাশিত হ'তো। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রায়চাঁদ

প্রেমচাঁদ বৃত্তি' পান, বিজ্ঞানে এম. এ. ও আইনের শেষ পরীক্ষায় পাস করেন। অল্পকালের মধ্যেই আইন-ব্যবসায়ে তিনি যশস্বী হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন।



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং পরে কিছু-দিনের জন্য প্রধান বিচারপতি হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উপাচার্য' হন।

এই পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা নিতো, এম. এ. পড়ানো হ'তো বিভিন্ন কলেজে। আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের নিযুক্ত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়েই এম. এ. পড়বার ব্যবস্থা করেন। এ পর্যন্ত মাতৃভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন মর্যাদা দেওয়া হ'তো না। আশুতোষই বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পড়ানো ও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থাও তিনিই করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। এর মধ্যে তাঁর জাতীয়তাবাদী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সক্রিয়-ভাবে রাজনীতিতে যোগ না দিলেও তাঁর গভীর দেশপ্রেম ছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ ক'রে ইংরেজ সরকার যখন কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী নিয়ে গেলো, তখন তাতে বাংলার কি গুরুতর ক্ষতি হবে, তা তিনিই সর্বপ্রথম দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও ছিল জাতীয়তাবাদী মনের পরিচয়। তিনি উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গেও বাঙ্গালী পোশাকে

স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতেন। একবার এক দেশীয় রাজ্যে আইন-উপদেষ্টা রূপে গিয়েছিলেন আশুতোষ। আশুতোষকে দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় পাগড়ি বা টুপি পরে যেতে অনুরোধ করা হ'লে তিনি তাতে অস্বীকৃত হন। এবং দেশীয় রাজা তাঁকে বিনা পাগড়িতে বা টুপিতেই সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন।

বিদ্যাসাগর এদেশে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন করেছিলেন। তবু সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে বিধবা-বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হ'তো। আশুতোষ আত্মীয়স্বজনের ঘোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁর বিধবা মেয়ে কমলার বিবাহ দিলেন। আশুতোষের চরিত্রের ও সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। তাই লোকে তাঁকে **বাংলার বাঘ** বলতো। ইংরেজ সরকার তাঁকে **স্যার** উপাধিতেও ভূষিত করেছিল।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি মামলার ব্যাপারে পাটনা গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর জ্বর ও ভেদবমি হয় এবং নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র।—জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার রাঢ়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা **ভগবানচন্দ্র** বসু ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, পদস্থ কর্মচারী—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জগদীশচন্দ্র ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস ক'রে ডাক্তারি পড়বার জন্য বিলাত যান। তিনি সেখানে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারি পড়া ছেড়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়তে শুরু করেন এবং পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় **ট্রাইপস** পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বি. এস্‌-সি. ডিগ্রি পান।


জগদীশচন্দ্র বসু

দেশে ফিরে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চালাতে থাকেন। তিনি **তড়িৎ-তরঙ্গ** সম্পর্কে যে তথ্য আবিষ্কার করেন, সেজন্য তিনি পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের কাছে প্রশংসা পান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে **ডক্টর অব সায়েন্স** উপাধি দেয়।

জগদীশচন্দ্র বেতারে সংবাদ পাঠাবার বিষয়েও গবেষণা করেন। তখনও বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদান বা বেতার আবিষ্কৃত হয়নি। জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণায় **বেতার** সম্পর্কে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে-ছিলেন, তাই ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কোনি যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ ক'রে দেখান এবং বেতার উদ্ভাবিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র **আলোক** সম্পর্কে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেন, তাতে বিজ্ঞানজগতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু উদ্ভিদ্-জীবন নিয়ে তাঁর গবেষণাই তাঁকে অমর করেছে। তিনিই সর্বপ্রথম যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ ক'রে দেখালেন যে, উদ্ভিদের অনুভব-শক্তিও আছে। উদ্ভিদ্‌রা বেদনা বোধ করে, ভয় পায়, বিষের যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ে। তাঁর এই আবিষ্কার দেখাবার জন্য তিনি ইউরোপে যান এবং সর্বত্রই বিপুল সম্মান পান।

বাংলাদেশে বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা ছিল না। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের উন্নতি ও বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুবিধার জন্য ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে **বসু বিজ্ঞান মন্দির** নামে তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগারটি স্থাপন করেন।

তিনি সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনে যোগ না দিলেও তাঁর দেশপ্রেমের অভাব ছিল না। তাঁর স্বাজাত্যবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। সমান পদে নিযুক্ত ইংরেজ ও বাঙ্গালী অধ্যাপকদের বেতনের তারতম্য ছিল, ইংরেজ অধ্যাপকরা অনেক বেশি বেতন পেতেন। জগদীশচন্দ্র এর প্রতিবাদে দীর্ঘকাল মাইনে নেন নি। সরকার শেষ পর্যন্ত এই বৈষম্য দূর করে। সরকার তাঁকে **স্যার** খেতাবও দিয়েছিল।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, ৮০ বৎসর বয়সে, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বা পি. সি. রায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা জেলার রাঢ়লি-কাতিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম **হরিশচন্দ্র রায়**। হরিশচন্দ্র রায় ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। গ্রামের দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য তিনি নিজের বাড়িতেই একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বালক প্রফুল্লচন্দ্র ঐ বিদ্যালয়ে পড়া শেষ ক'রে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। হেয়ার স্কুলে পড়ার সময় তিনি অসুস্থ হ'লে কিছুদিন তাঁর পড়াশুনো বন্ধ থাকে। কিন্তু তিনি বাড়িতে বাবার গ্রন্থাগারে পড়াশুনো করতে থাকেন। ঐ সময়ে গ্যালিলিও, নিউটন, বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করে।



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

তিনি সুস্থ হ'লে কলকাতার এলবার্ট স্কুলে এসে ভর্তি হন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস ক'রে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিট্যুশনে (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজে) পড়তে থাকেন। ঐ সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিট্যুশনে অধ্যাপনা করতেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তাঁকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করে। তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিট্যুশনে পড়লেও প্রেসিডেন্সি কলেজে স্যার আলেকজাণ্ডার কেটলার, স্যার জন ইলিয়ট প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা শুনতে যেতেন। এইভাবে বিজ্ঞান ও দেশপ্রেম প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'গিলক্রাইস্ট বৃত্তি' পেয়ে বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত যান। সেখানে

তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছ বছর পড়ে বিজ্ঞানে **ডক্টর** উপাধি লাভ করেন।

তিনি দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সেই সঙ্গে গবেষণা করতে থাকেন। তাঁর পারদঘটিত গবেষণা রসায়নে যুগান্তর আনে। তিনি পনেরো বৎসর দীর্ঘ পরিশ্রম ক'রে প্রাচীন ভারতের রসায়নের ইতিহাস রচনা করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন আদর্শ অধ্যাপক। এ যুগের বহু বিখ্যাত বাঙ্গালী বিজ্ঞানীই তাঁর প্রিয় ছাত্র। কিন্তু অধ্যাপনা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেই তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশের দৈন্য-দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত করতো। তিনি গান্ধীজীর মতোই দেশবাসীকে নিয়মিত চরকায় সূতো কাটতে বলেন। তিনি নিজেও নিয়মিত চরকায় সূতো কাটতেন ও খদ্দর পরতেন। তিনি বাঙ্গালীর দারিদ্র্য ও কর্মহীনতার জন্য তাদের শ্রমবিমুখতা, ডিগ্রির মোহ ও চাকরির লালসাকেই দায়ী করেন। তিনি নিজে সামান্য ৮০০ টাকা মূলধন নিয়ে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে **বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস** স্থাপন করেন। পরে ঐ কারখানার মূলধন কয়েক লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। তিনি বাঙ্গালীদের চাকরির মোহ ছেড়ে সামান্য মূলধন নিয়েই ব্যবসা করতে বলেন।

আর্তের সেবা ছিল তাঁর কাছে ধর্ম। দেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী দেখা দিলে তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রদল নিয়ে সেবাকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, ক্ষুধিত ও বিপন্নের জন্য পথে পথে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে অর্থ সংগ্রহ করতেন।

প্রফুল্লচন্দ্রকে ইংরেজ সরকার **স্যার** উপাধি দিয়েছিল। কিন্তু খাদ্যে, পরিচ্ছদে, জীবনযাত্রায় সাহেবিয়ানা তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন বাঙ্গালী। খাদ্যে ও বেশভূষায় তিনি অসামান্য সংযম পালন করতেন। তিনি বলতেন, "যে-দেশের মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না, সে দেশের লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা অপরাধ নয়, মহাপাপ।"

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জীবনে বিজ্ঞান, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজসেবার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৮৩ বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

অশ্বিনীকুমার দত্ত।—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালের বাটাজোড় গ্রামে অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম **ব্রজমোহন দত্ত।**



অশ্বিনীকুমার দত্ত

অশ্বিনীকুমার বাল্যকালে বরিশালেই পড়াশুনা করেন। পরে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে এসে ভর্তি হন। ঐ সময়ে ষোলো বৎসর বয়স না হ'লে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দেওয়া হ'তো না। অশ্বিনীকুমার যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, তখন তাঁর বয়স ষোলো না হওয়ায় তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর বয়স কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাল্যকাল থেকেই অশ্বিনীকুমারের নীতিবোধ এতোই প্রবল ছিল যে, তিনি এই ব্যাপারটি জানতে পারায় একবছর কলেজে অনুপস্থিত থেকে এই দুর্নীতির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ., ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় পাস করেন।

শিক্ষান্তে তিনি শ্রীরামপুর চাতরা হাইস্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তারপর বরিশালে গিয়ে ওকালতি করতে থাকেন। কিন্তু ওকালতিতে মক্কেলের জন্য প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হতো। তাই তিনি ওকালতি ছেড়ে বরিশালে নিজে একটি বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে তাতেই শিক্ষকতা করতে লাগলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর পিতার নামে **ব্রজমোহন কলেজ** স্থাপন করেন এবং ঐ কলেজে বিনা বেতনে দীর্ঘ পঁচিশ বছর অধ্যাপনা করেন।

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারেও অশ্বিনীকুমার অগ্রণী ছিলেন। তিনি নিজে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বালিকাদের বিদ্যালাভে উৎসাহদানের জন্য সরকারের হাতে প্রচুর টাকা তুলে দিয়ে **ব্রজমোহন পুরস্কার** নামে একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন।

তিনি সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। বঙ্গভঙ্গের সময়ে কলকাতায় যে শিবাজী উৎসব হয়, তার প্রধান অধিবেশনে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। নীতিবোধ ও চরিত্রগঠনের জন্য তিনি কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর **ভক্তিযোগ** বইখানি বিপ্লবী যুবকদের চরিত্র গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের চারণকবি **মুকুন্দ দাসের** তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।

অশ্বিনীকুমার নীতিবোধ, চরিত্রবল ও দেশপ্রেমের জন্য অমর হয়েছেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম।—১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম **কাজী ফকির আহম্মদ**। ফকির আহম্মদের পূর্বপুরুষ সম্ভবত মুঘল আমলে কাজী ছিলেন। তাই তাঁরা পুরুষানুক্রমে আজও কাজী উপাধি বহন করেন। ফকিরসাহেব কাজীর বংশধর হ'লেও এখন অত্যন্ত গরীব হয়ে পড়েছিলেন। তাই বালক নজরুলকে দারিদ্র্যের মধ্যেই মানুষ হ'তে হয়। কালেই নজরুলের পিতৃবিয়োগ ঘটে। এখন তাঁর ওপর সংসারের দায়িত্বও এসে পড়ে।



কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ ক'রে বালক বয়সেই কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। বয়সের তুলনায় তিনি যেমন বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর কবিত্বশক্তি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা। ঐ সময়ে চুরুলিয়ায় অনেক পল্লীকবি ছিলেন। বালক নজরুল তাঁদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরা 'লেটো নাচ' নামে এক ধরনের গ্রাম্য গীতাভিনয়ের জন্য গান ও পালা বাঁধতেন। নজরুলও গান ও পালা বাঁধতে লাগলেন। এইভাবে তাঁর কবিজীবনের সূত্রপাত হ'লো। তিনি নিজেও গান গাইতে পারতেন, গানে সুর দিতেন, গান শেখাতেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ঐ অঞ্চলের লেটো নাচের দলের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠলেন।

সেই সঙ্গে তাঁর পড়াশুনাও চললো। লেটো দলের আকর্ষণ কিন্তু তাঁকে বেশীদিন আটক রাখতে পারলো না। তিনি গ্রাম ছেড়ে ভাগ্যের সন্ধানে আসানসোল শহরে চলে এলেন। এখানে তিনি কিছুদিন একটি খাবারের দোকানে ছোকরার কাজ করেন। তাঁর বুদ্ধি ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আসানসোলের এক দারোগা ময়মনসিংহে নিয়ে গিয়ে একটি হাইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেন। সেখানে কিছুদিন পড়াশুনো করার পর তিনি রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন। তিনি পড়াশুনোয় খুবই কৃতিত্ব দেখান। ঐ সময়ে তাঁর সাহিত্যচর্চাও পুরোদমে চলতে থাকে।

১৯১৭ সালে, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে, নজরুল ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ঐ সময় হঠাৎ তিনি পড়াশুনো ছেড়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন। সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালে নজরুল প্রচুর গল্প, কবিতা ও গান লেখেন এবং ঐগুলি কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে থাকে। এই সৈনিক-কবির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় এসে সাহিত্যকেই তাঁর পেশা ও নেশারূপে গ্রহণ করেন। ঐ সময় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হ'লে

তিনি তাতে যোগ দেন এবং ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক হন। এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয় এবং তিনি **'বিদ্রোহী কবি'** নামে পরিচিত হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ধূমকেতু' নামে তাঁর বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন। সরকার 'ধূমকেতু' কাগজ বন্ধ ক'রে দেয় এবং নজরুল কারারুদ্ধ হন। রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে তিনি কবি-সাহিত্যিকদের সম্মুখে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর 'বল বীর বল উন্নত শির', 'দুর্গম-গিরি-মরুকান্তার', 'চল্ রে চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল', 'পাষাণ-কারার লৌহকপাট' প্রভৃতি কবিতা ও গান বিপ্লবীদের সমরসংগীত হয়ে ওঠে। তিনি 'লাঙ্গল' নামেও একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে তিনি ফজলুল হকের 'দৈনিক নবযুগ' কাগজও অনেকদিন সম্পাদনা করেন।

নজরুলের ধর্মের গোঁড়ামি বিন্দুমাত্র ছিল না। তিনি কবি ও গীতিকাররূপে একই সঙ্গে বহু ইসলাম সংগীত ও শ্যামা-সংগীত রচনা করেন। গান রচনায় রবীন্দ্রনাথের পর আর কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। হিন্দু ও মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতির এক অপূর্ব মিলন ঘটেছিল তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে।

তিনিই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী কবি, যিনি সাম্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তাঁর 'সাম্যের গান গাই' শ্রেণীর কবিতাবলী খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সংগীতটি প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

কবি যখন তাঁর খ্যাতির শীর্ষে, তখন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে, দুরারোগ্য মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত হন। কবি আজও জীবিত আছেন। তিনি সম্পূর্ণ সম্বিৎহীন—আজ তিনি তাঁর নিজের জীবন্ত প্রতিমূর্তিমাত্র।

ফজলুল হক।—আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালের চাখার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা **মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ** ছিলেন সরকারী উকিল। ফজলুল বাল্যকাল থেকে খুবই

মেধাবী ছিলেন। তিনি গ্রামের স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনো করার পর জেলা-স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একই সঙ্গে গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় 'ট্রিপল্ অনার্স' নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। তিনি আইন পরীক্ষায় পাস ক'রে আ শু তো ষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষানবিস হয়ে কিছুদিন থাকেন। তিনি ১৯০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। স্যার আশুতোষের মতোই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর সুগভীর অনুরাগ ছিল। তিনি কিছুদিন 'ভারত-সুহৃদ্' ও 'বালক' পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। তিনি পরবর্তীকালেও বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত 'নবযুগ' ও 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।



ফজলুল হক

তাঁর মতো স্বাধীনচেতা লোকের পক্ষে বেশিদিন সরকারী চাকরি করা সম্ভব ছিল না। তিনি ১৯১২ সালে সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই আইন ব্যবসায়ে তাঁর পসার জমে ওঠে। ঐ সময়ে, ১৯১৩-১৬ পর্যন্ত, তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সমিতির প্রধান সম্পাদকের কাজ করেন।

ফজলুল হক মুসলিম লীগের হয়ে বিভিন্ন সময়ে কাজ করলেও তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। বাল্যকাল থেকেই বহু হিন্দু ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক জীবনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতির মতো বিশিষ্ট হিন্দু নেতারা তাঁর সহযোগী ছিলেন। তিনি কৃষক-প্রজা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং ১৯৩৭ সালের

নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে বাংলার মুখ্য (প্রধান) মন্ত্রী হন। তিনি জীবনে একদিন কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শিক্ষাদপ্তর নিজের হাতে রাখেন এবং কলকাতায় ও মফঃস্বলে বহু স্কুল-কলেজ স্থাপন করেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

পূর্ব বাংলায় পাকিস্থানী শাসনে জনসাধারণ যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো, তখন ফজলুল হক পূর্ব বাংলায় তাঁর **কৃষক শ্রমিক পার্টি** গঠন করলেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষক শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ প্রভৃতি কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলিতভাবে নির্বাচনে জয়ী হ'লো। এখন অশীতিপর বৃদ্ধ ফজলুল হক হলেন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

এই সময় ফজলুল হক চিকিৎসার জন্য কলকাতা এলেন। কলকাতায় তিনি অভ্যর্থনা-সভায় বললেন, যতোই বিভেদ ও বাধার প্রাচীর তোলা হোক, বাঙালী জাতিকে কেউ পৃথক করতে পারবে না। তাঁর এই উক্তির বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রে পাকিস্থানের মুসলিম লীগ সরকার বললো, ফজলুল হক পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে এক করবার জন্য ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হ'লো। এর অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়।—প্রতাপাদিত্যের কাহিনী তোমরা পড়েছ। প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্ত রায়ের বংশে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার নাম **প্রকাশচন্দ্র রায়**। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়।

বিধানচন্দ্র ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাস ক'রে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তিনি যথাসময়ে মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করেন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণা ক'রে ডক্টর অব মেডিসিন (এম. ডি.) উপাধি পান। তারপর তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান এবং চিকিৎসাবিদ্যার সর্বোচ্চ উপাধি এফ. আর. সি. এস. এবং এম. আর. সি. পি. লাভ ক'রে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে তিনি কিছুদিন চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপনা করেন এবং অল্পকালের মধ্যে চিকিৎসকরূপে যশস্বী হয়ে ওঠেন। তিনি অধ্যাপকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হন। তিনি কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হন। তখন থেকেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন।


ডঃ বিধানচন্দ্র রায়

বিধানচন্দ্রের দেশপ্রেম ছিল অসাধারণ। তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সঙ্গে দেশসেবার কাজেও নিজেকে নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন চিত্তরঞ্জনের অনুগামী। তিনি একটি নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথের মতো দেশবরেণ্য নেতাকেও পরাজিত করে-ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেলো এবং বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হ'লো—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্থান)। ঐ সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় এক কোটি হিন্দু ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিল। তাই পশ্চিমবঙ্গ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। কংগ্রেস বিধানচন্দ্রকেই সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করলো। বিধানচন্দ্র তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

বিধানচন্দ্র সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বহু কলকারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন, সুপরিকল্পিত শিল্পনগরী গড়ে তোলেন, উদ্‌বাস্তু সমস্যার সমাধান করেন, অসংখ্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বহু বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন ক'রে শিক্ষার প্রসার ঘটান। তিনি অসংখ্য পথঘাট নির্মাণ করান ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করেন। বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ও বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যও তিনি নানা ব্যবস্থা করেন। লর্ড

কর্নওয়ালিস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছিলেন, তা তিনিই উচ্ছেদ ক'রে জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করেন। পশ্চিমবঙ্গের যা কিছু উন্নতি ঘটেছে, তার মূলে ছিল তাঁর উদ্যোগ ও কর্মশক্তি।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে একাশীতিতম জন্মদিনেই বিধানচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে।

অনুশীলনী

১। এঁদের সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ :

(ক) স্বামী বিবেকানন্দ; (খ) ভগিনী নিবেদিতা; (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (ঘ) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; (ঙ) আচার্য জগদীশচন্দ্র; (চ) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র; (ছ) অশ্বিনীকুমার দত্ত; কাজী নজরুল ইসলাম; (ঝ) ফজলুল হক; (ঞ) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ—অবিভক্ত ও বিভক্ত বঙ্গের সীমা

ইংরেজদের বিভেদ-নীতি।—ইংরেজরা ভারতবর্ষকে পদানত রাখবার জন্য বিভেদ-নীতির আশ্রয় নিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই তারা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করেছিল। তারা মুসলমানদের বুঝিয়েছিল, তাদের যতো দুঃখের মূলে আছে হিন্দুরা। তাই ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের প্ররোচনায় মুসলমানরা ঢাকায় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। এর নাম মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো। মুসলিম লীগের নেতৃত্ব করতে লাগলেন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যারিস্টার **মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না।**

জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম।—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা ভারতের জনবল ও ধনবল ব্যবহার করেছিল। তাই

ভারতবাসীরা আশা করেছিল, যুদ্ধ-শেষে ইংরেজরা তাদের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেবে। কিন্তু ইংরেজরা তা না ক'রে ইচ্ছামত ভারতবাসীদের গ্রেপ্তার ক'রে জেলে আটক রাখবার জন্য আইন করলো। এই আইন **রাউলাট আইন** নামে পরিচিত। এই আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশে আন্দোলন শুরু হ'লো। সরকার সারা দেশের জনসাধারণের উপর লাঠি ও গুলি চালালো। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করলো এবং পাঞ্জাবের অমৃতসরে **জালিয়ানওয়ালাবাগে** বৈশাখী মেলায় সমবেত অসংখ্য নরনারী শিশুকে গুলি চালিয়ে হত্যা করলো। সারা দেশ এর প্রতিবাদে ও বিক্ষোভে ক্রোধে ফেটে পড়লো। মুসলমানদের **খলিফা** বা ধর্মনেতা ছিলেন তুরস্কের সুলতান। তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজরা সুলতানের প্রতি দুর্ব্যবহার করলো। ইংরেজদের এই আচরণে ভারতের মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হ'লো। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলো। এই আন্দোলনের নাম **খিলাফত আন্দোলন**। গান্ধীজীর চেষ্টায় মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সংগে একযোগে আন্দোলন করতে রাজী হ'লো। এইভাবে রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং খলিফার প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে এবং স্বরাজ বা পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একযোগে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলো—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে।

কিন্তু এক বৎসর আন্দোলন চলার পর উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরায় ক্রুদ্ধ জনতা থানা পুড়িয়ে দেওয়ায় ও পুলিশ হত্যা করায় গান্ধীজী হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। এদিকে তুরস্কেও কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের জনসাধারণ তুরস্কের সুলতানকে বিতাড়িত ক'রে দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলো। তাই ভারতীয় মুসলমানদের খলিফার জন্য আন্দোলন করবার আর কারণ রইলো না। এখন আন্দোলন থেমে যাওয়ায় আবার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিরোধ ও রেষারেষি শুরু হ'লো।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস স্বাধীনতার দাবীতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করলো। মুসলিম লীগ এই আন্দোলনে যোগ দিল না। কিন্তু কংগ্রেস ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সারা দেশে যে আন্দোলন করলো, তার ফলে ভারতবাসীকে কিছুটা সন্তুষ্ট করবার জন্য ইংরেজরা ১৯৩৫ সালে **ভারত শাসন আইন** পাস করলো। এই আইন অনুসারে সারা দেশকে এগারোটি প্রদেশে ভাগ করা হ'লো। স্থির হ'লো, প্রদেশের আইনসভায় যে দলের সদস্যসংখ্যা বেশি হবে, তারাই মন্ত্রিসভা বা সরকার গঠন করবে। তবে প্রদেশের গভর্নরের হাতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাতিল করার ক্ষমতাও থাকবে। কংগ্রেস গভর্নরের এই অত্যধিক ক্ষমতার তীব্র প্রতিবাদ করলো। তবে এই ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে যখন নির্বাচন হ'লো, তখন কংগ্রেস সারা দেশে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো। নির্বাচনে কংগ্রেস এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো। মুসলিম লীগ কোনও প্রদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো না। গভর্নররা মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না, বড়লাট এই প্রতিশ্রুতি দিলে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করলো।

পাকিস্থানের দাবি।—মুসলিম লীগ বুঝলো, ভারতবর্ষে তাদের ক্ষমতা লাভের কোন আশা নেই। কারণ, দেশে হিন্দুর সংখ্যা বেশি; তাছাড়া, মুসলমানরাও কংগ্রেসে আছেন। কংগ্রেসই দেশের সর্বাধিক ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান, সুতরাং দেশ স্বাধীন হ'লে কংগ্রেসই দেশে শাসন-ক্ষমতায় আসবে। তাই ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগ লাহোর অধিবেশনে ভারতের মুসলিমপ্রধান প্রদেশ ও অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি তুললো। এই মুসলিমপ্রধান পৃথক রাষ্ট্রের তারা নাম দিলো **পাকিস্থান**।

ভারতবিভাগ ও দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ।—১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ বাধলো। ইংরেজরা ভারতীয়দের কোনও মতামত না নিয়েই ভারতকে যুদ্ধরত দেশ ব'লে ঘোষণা করলো। ইংরেজরা এভাবে জনমতকে উপেক্ষা করায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি ত্যাগ করলেন এবং

তাঁরা আবার আন্দোলনের সংকল্প নিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে জাপানও যুদ্ধ করছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ জয় ক'রে ভারতের সীমান্তে এসে পৌঁছলো। গান্ধীজী বললেন, ইংরেজের বিরুদ্ধেই জাপানের যুদ্ধ। ইংরেজরা যদি ভারত ছেড়ে যায়, তবে জাপান ভারত আক্রমণ করবে না। সুতরাং ইংরেজরা **ভারত ছাড়ো**। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের নেতাদের বন্দী করলো। সারা দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হ'লো। ইংরেজরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হ'লো। কিন্তু ভারতে স্বাধীনতার দাবি প্রবল হয়ে উঠলো।

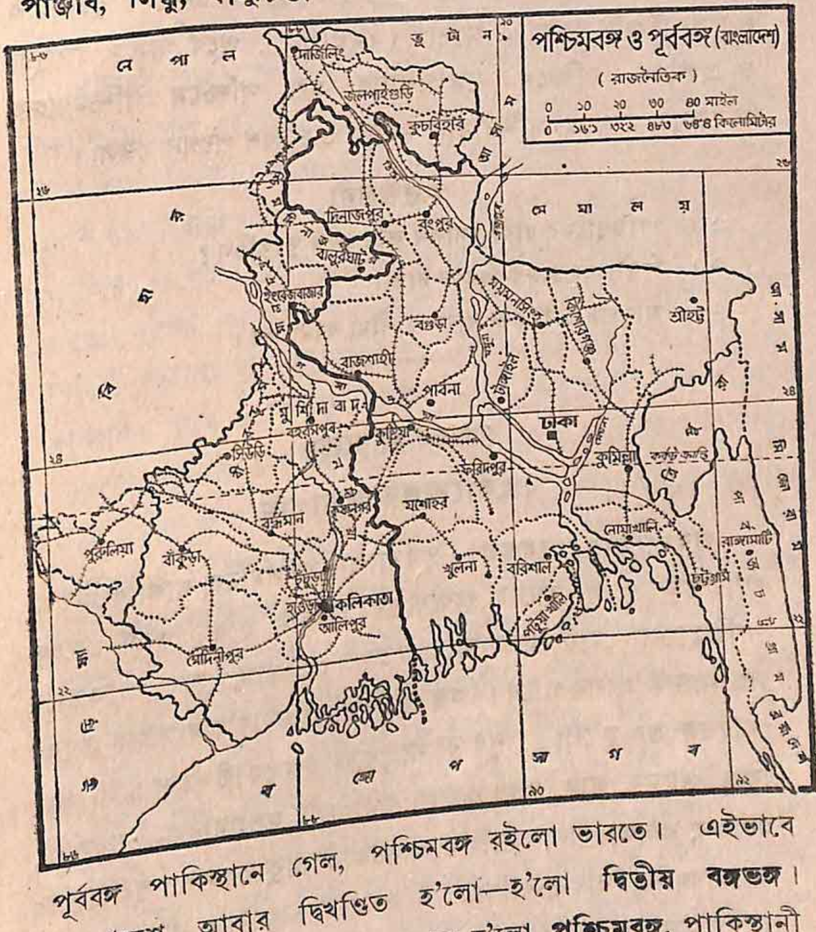
যুদ্ধের পরে ভারতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন হ'লো। নির্বাচনে কংগ্রেস অমুসলমান আসনগুলির প্রায় সবগুলিই পেলো। মুসলিমপ্রধান উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও অধিকাংশ আসনই কংগ্রেস পেলো। তবে অন্যান্য প্রদেশে মুসলিম আসনের বেশির ভাগই পেলো মুসলিম লীগ।

ইংরেজ সরকার ঘোষণা করলো, ভারতে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু হবে, তা ভারতবাসীরাই স্থির করবে। এজন্য কেন্দ্রীয় আইন-সভায় নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে **গণ-পরিষদ** গঠিত হলো। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ২৮৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ২০৪টি ও মুসলিম লীগ ৭৩টি। পাকিস্থানের দাবি গণপরিষদে গৃহীত হবে না বুঝে মুসলিম লীগ পাকিস্থানের দাবিতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট **প্রত্যক্ষ সংগ্রাম** ঘোষণা করলো। এ সংগ্রাম ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়—হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে।

১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ কলকাতায় ভয়ংকর দাঙ্গা বাধালো। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। হিন্দু ও মুসলমানের রক্তে সারা দেশ ভেসে গেল। কংগ্রেস দেশ-বিভাগের বিরোধী ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য কংগ্রেস দেশ-বিভাগ মেনে নিলো। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলো। সেই সঙ্গে

ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হ'লো। এক অংশের নাম হ'লো **ভারত,** অন্য অংশের নাম **পাকিস্থান।**

পাকিস্থান গঠিত হ'লো আসামের **শ্রীহট্ট সহ পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত** প্রদেশ নিয়ে।



পূর্ববঙ্গ পাকিস্থানে গেল, পশ্চিমবঙ্গ রইলো ভারতে। এইভাবে বাংলাদেশ আবার দ্বিখণ্ডিত হ'লো—হ'লো **দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ।** বাংলাদেশের ভারতীয় অংশের নাম হ'লো **পশ্চিমবঙ্গ,** পাকিস্থানী অংশের নাম **পূর্ব বাংলা** (পরে **পূর্ব পাকিস্থান**)।

অবিভক্ত বাংলার সীমা ছিল **উত্তরে** সিকিম ও ভুটান, **পূর্বে** আসাম, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশ, **দক্ষিণে** বঙ্গোপসাগর ও উড়িষ্যা এবং **পশ্চিমে** বিহার ও উড়িষ্যা। এখন **বিভক্ত বাংলায়** পশ্চিমবঙ্গের সীমা

হ'লো **উত্তরে** সিকিম ও ভুটান, **পূর্বে** আসাম (মেঘালয়) ও পূর্ব পাকিস্থান (দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোহর ও খুলনা জেলা), **দক্ষিণে** উড়িষ্যা, বঙ্গোপসাগর ও পূর্ব পাকিস্থান, **পশ্চিমে** বিহার ও উড়িষ্যা। পূর্ব পাকিস্থানের সীমা হ'লো **উত্তরে** পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা ও আসাম (মেঘালয়), **পূর্বে** আসাম, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশ, **দক্ষিণে** বঙ্গোপসাগর এবং **পশ্চিমে** পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলা।

অনুশীলনী

১। পাকিস্থানের দাবী মুসলিম লীগ কেন তুলেছিল ?

২। দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের বিবরণ দাও।

৩। অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলার সীমা বর্ণনা কর।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অভ্যুত্থান

পূর্ব বাংলার মোহভঙ্গ।—পূর্ব বাংলার মুসলমানরা আশা করেছিল, পাকিস্থান হ'লে তাদের দুঃখদৈন্যের অবসান হবে ; তারা যেহেতু পাকিস্থানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ, তারা পাকিস্থানে সম্মানজনক আসন পাবে। কিন্তু পাকিস্থান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মোহভঙ্গ শুরু হ'লো। পূর্ব বাংলা থেকে এক কোটি হিন্দু চলে গেল, কিন্তু তাদের স্থান পূরণ করলো অবাঙালী মুসলমানরা—ব্যবসায়ী, মহাজন, কলকারখানার মালিক ও সরকারী চাকুরের দল। পূর্ব বাংলার কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী চাকুরিতে বাঙ্গালীর স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে এলো।

বাংলাদেশকে দু' টুকরো করায় পূর্ব বাংলারই ক্ষতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের পাট, তামাক, মাছ প্রভৃতি আসতো পশ্চিম বাংলায়, পশ্চিম বাংলা থেকে লোহা-ইস্পাত, কয়লা ও শিল্প-দ্রব্য যেতো পূর্ব বাংলায়। কিন্তু পাকিস্থান সরকার ভারতের সঙ্গে

ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ ক'রে দেওয়ায় এখন পূর্ব বাংলাকে দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, চীন থেকে আনতে হ'লো কয়লা। দূরদেশ থেকে আনতে হ'লো লোহা-ইস্পাত, শিল্প-সামগ্রী। পূর্ব বাংলায় কলকারখানা গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করলো না পাকিস্থানী সরকার। যে দু-চারটি কলকারখানা হ'লো, তাও পশ্চিম পাকিস্থানীদের মূলধনে এবং পশ্চিম পাকিস্থানী শ্রমিকদের জন্যে। পশ্চিম পাকিস্থানে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য চড়া দামে পূর্ব বাংলায় বিক্রি করা হ'তে লাগলো। যেসব বিদেশী মাল আমদানি করা হ'লো তাও পশ্চিম পাকিস্থানী ব্যবসায়ীরা এনে বেশি দামে বিক্রি করতে লাগলো পূর্ব বাংলায়। পূর্ব বাংলার পাটই পাকিস্থানের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতো। কিন্তু সে টাকা খরচ হ'তো পশ্চিম পাকিস্থানের ঘাটতি মেটাতে। উন্নয়নের জন্য যেসব বিদেশী সাহায্য বা ঋণ আসতো, তারও সামান্যই ব্যয় হ'তো পূর্ব বাংলায়। কৃষি ও শিক্ষার উন্নতি না হয়ে ক্রমেই অবনতি হ'লো। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে ছিল শতকরা ৮৪ জন পশ্চিম পাকিস্থানী, মাত্র ১৬ জন বাঙ্গালী। সৈন্যবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্থানী পাঁচ লাখ, বাঙ্গালী মাত্র বিশ হাজার।

ভাষা আন্দোলন।—কিন্তু এসব নীরবে সহ্য করবার মানুষ নয় বাঙ্গালীরা। পাকিস্থান হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই আন্দোলন শুরু হলো রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্ন নিয়ে। পাকিস্থানে বাংলা ভাষায় কথা বলে শতকরা ৫৬ জন। আর উর্দুতে শতকরা মাত্র ৬ জন। পাকিস্থান সরকার স্থির করলো, উর্দুই হবে রাষ্ট্র ভাষা। পূর্ব বাংলায় এর বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালেই আন্দোলন শুরু হ'লো। পাকিস্থান সরকার এই আন্দোলন কঠোর হস্তে দমনের চেষ্টা করা সত্ত্বেও আন্দোলন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠলো। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবিতে সারা বাংলায় হরতাল হ'লো। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল ক'রে বেরুলে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র মারা গেলেন। সারা দেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। শত শত ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা গ্রেপ্তার

হলেন। পুলিশের গুলিতে বহু লোক হতাহত হলেন। তবু বিক্ষোভ ও আন্দোলন দমন করা গেল না। সরকারকে শেষ পর্যন্ত উর্দু'র সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে হ'লো।

রাজনৈতিক আন্দোলন।—পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক দাবী নিয়েও শুরু হ'লো আন্দোলন। মুসলিম লীগই ছিল পাকিস্থানের একমাত্র রাজনৈতিক দল এবং মুসলিম লীগ দলই দেশ শাসন করছিল। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিলো। পাকিস্থান হওয়ার আগে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন **হোসেন শহীদ সুরাবর্দী**। তিনি এবং পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতা **মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি** দুজনে মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন **আওয়ামি লীগ**। আওয়ামি লীগের সাধারণ সম্পাদক হলেন তরুণ নেতা **শেখ মুজিবর রহমান**। পরে মওলানা ভাসানি পৃথকভাবে তাঁর **জাতীয় আওয়ামি লীগ** প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুরাবর্দীর মৃত্যু হয়। এখন আওয়ামি লীগের প্রধান নেতা হলেন মুজিবর রহমান।

শেখ মুজিবর রহমান ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জেলার টাঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে গোপালনগরে একটি মিশনারী স্কুলে পড়েন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান মওলানা আজাদ কলেজ) পড়েন এবং মুসলিম লীগের ছাত্র কর্মীরূপে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি কলকাতায় মুসলিম লীগ নেতা ও বাংলার অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সুরাবর্দীর সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালিতে দাঙ্গার পর বিহারে দাঙ্গা বাধলে তিনি শান্তি মিশনে বিহারে যান। স্বাধীনতালাভ ও বঙ্গবিভাগের পর পূর্ববঙ্গে চলে যান



শেখ মুজিবর রহমান

এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে থাকেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাষা আন্দোলন শুরু হ'লে তিনি তাতে নেতৃত্ব দেন এবং একাধিক বার কারারুদ্ধ হন। তাঁর সংগঠন-শক্তি ও জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

অবিভক্ত বাংলার অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকও পূর্ব বাংলায় চ'লে গিয়েছিলেন। তিনি ঐ সময়ে অশীতিপর বৃদ্ধ হ'লেও তাঁর কর্মশক্তি ও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি পূর্ব বাংলায় নূতন ক'রে **প্রজা শ্রমিক পার্টি** গঠন করেছিলেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হ'লে ফজলুল হকের নেতৃত্বে আওয়ামি লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও অন্যান্য দল নিয়ে একটি **যুক্তফ্রণ্ট** গঠিত হ'লো। তাঁরা মুসলিম লীগের প্রার্থীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত ক'রে পূর্ব বাংলায় একটি প্রগতিশীল সরকার গঠন করলেন। ঐ সরকারে মুজিবর রহমানও হলেন অন্যতম মন্ত্রী।

কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট সরকার স্থায়ী হ'লো না। কেন্দ্রে মুসলীম লীগ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তারা পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হ'লো। ঐ সময়ে ফজলুল হক চিকিৎসার জন্য কলকাতা এসেছিলেন। কলকাতায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হ'লে তিনি অভ্যর্থনার উত্তরে বললেন, "বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যতোই প্রাচীর তোলা হ'ক, তার হৃদয়ের বন্ধন কেউ ছিন্ন করতে পারবে না।" ফজলুল হকের ভাষণের সংবাদ বিকৃত ক'রে পাকিস্থানী কাগজে ছাপা হ'লো। বলা হ'লো, ফজলুল হক দুই বাংলাকে আবার এক করতে চান, তিনি পাকিস্থানবিরোধী। কেন্দ্রীয় পাকিস্থানী সরকার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে দিলো এবং দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে ফজলুল হককে কারারুদ্ধ করলো।

কেন্দ্রীয় সরকারেও ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন চলছিল। প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হ'লে দশ বছরের মধ্যে বাংলার খাজা নাজিমুদ্দিন, মহম্মদ আলি, পাঞ্জাবের মহম্মদ আলি চৌধুরী, ফিরোজ খাঁ নুন, বাংলার সুরাবর্দী, পাঞ্জাবের চুন্দ্রিগড় ও বাংলার মীরজাফরের বংশধর ইস্কান্দর মির্জা প্রধান মন্ত্রী

হয়েছিলেন। শেষে **জেনারেল আয়ুব খাঁ** ইস্কান্দর মির্জাকে বিতাড়িত ক'রে শাসনক্ষমতা দখল করলেন। সারা পাকিস্থানে সামরিক শাসন চালু হ'লো।

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে পূর্ববঙ্গে আন্দোলন চলতে লাগলো। আয়ুব খাঁ কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করলেন। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হ'লে পূর্ব বাংলার বাঙ্গালীদেরই লাভ। কারণ পাকিস্থানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ বাঙ্গালী। ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতায় তাদেরই আসার কথা। কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাবীদের চক্র তা কোনমতেই হ'তে দিতে চাইলো না।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে যখন পাকিস্থানের দাবি প্রথম তোলা হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল, পাকিস্থানে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং পাকিস্থান হবে একটি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়নি। তাই গণতান্ত্রিক সংবিধান ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন চলতে লাগলো। আয়ুব খাঁ এই আন্দোলন নির্মম হস্তে দমন করতে চাইলেন।

শেখ মুজিবর রহমানকে আয়ুব খাঁ পূর্ব বাংলায় তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করতেন। তাই তাঁকে কারারুদ্ধ করা হ'লো। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে মুজিবরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হ'লো—তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন। এই মামলার নাম দেওয়া হ'লো **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা**। এই মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে সারা দেশে অভূতপূর্ব বিক্ষোভ দেখা দিলো। গ্রেপ্তার ক'রে, গুলি চালিয়েও এই বিক্ষোভ যখন দমন করা গেল না, তখন আয়ুব খাঁ মুজিবরের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন।

আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে সারা পাকিস্থানে জনমত প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাই ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে তিনি পদত্যাগ

করলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন **জেনারেল মহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁ।** তিনি বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন ও দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচন।—ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো পাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন। স্থির হ'লো, পাকিস্থানের জাতীয় পরিষদে বা কেন্দ্রীয় আইনসভায় থাকবে ৩১ টি আসন। জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব বাংলা পাবে ১৬৯টি আসন এবং পশ্চিম পাকিস্থানের অন্যান্য প্রদেশ পাবে ১৪৪টি আসন। নির্বাচনের দিন স্থির হ'লো ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর। অক্টোবর মাসে ঘূর্ণিবাত্যা ও বন্যায় পূর্ব বাংলায় কয়েক লক্ষ লোক মারা গেল— এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় পৃথিবীর কোথাও কোনকালে ঘটেনি। কিন্তু তাতেও পাকিস্থানী সরকার নির্বিকার রইলো। বাংলাদেশের মানুষের বিক্ষোভ ও ক্রোধ চরমে পৌঁছলো। নির্বাচনে মুজিবর রহমানের আওয়ামি লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেলো। আর পশ্চিম পাকিস্থানে জুলফিকর আলি ভুট্টোর পিপল্‌স্ পার্টি পেলো ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮০টি।

পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম।—এই অবস্থায় দেশের শাসন-ক্ষমতা বাঙ্গালীদের হাতে চলে যায় দেখে ইয়াহিয়া খাঁ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে গড়িমসি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ডাকতে রাজী হলেন। কিন্তু জুলফিকর আলি ভুট্টোর দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে রাজী না হওয়ায় অধিবেশন ডাকা হ'লো না। এর প্রতিবাদে মুজিবর রহমান পূর্ব বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। এই আন্দোলন দমনের জন্য সৈন্যরা গুলি চালালো। তাতে ৩৫০ জনেরও বেশি লোক মারা গেল। এক হাজারেরও বেশি লোক আহত হ'লো। ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবরের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকায় এলেন। ভুট্টোও এলেন। আলাপ-আলোচনা চললো। কালহরণই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। পশ্চিম পাকিস্থান থেকে প্রচুর সৈন্য আসার অপেক্ষায় তাঁরা ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খাঁ ও ভুট্টো হঠাৎ চলে গেলেন। ঐ দিন রাত্রিতে ঢাকায় নেমে এলো এক ভয়ংকর রাত্রি। কয়েক হাজার সৈন্য ট্যাঙ্ক ও মেসিনগান নিয়ে ঢাকায় হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু করলো। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলগুলি ঘিরে ফেলে অমানুষিক ভাবে ছাত্রছাত্রীদের হত্যা করলো। মহল্লায় মহল্লায়, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নরনারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করলো। বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ঐ দিন রাত্রিতে তারা মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করলো। অন্যান্য নেতারা আত্মগোপন করলেন।

পাকিস্থানী বাহিনীর হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব ঢাকা থেকে অন্যান্য শহরে এবং শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিলো—পশ্চিমবঙ্গে, মেঘালয়ে, আসামে, ত্রিপুরায়। তবু পূর্ব বাংলার মানুষকে দমানো গেল না। পূর্ব বাংলার যুবকরা পাকিস্থানী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার একটি গ্রাম থেকে পূর্ব বাংলায় **বাংলাদেশ** নামে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হ'লো।

ভারতের অবদান।—ভারতে প্রায় এক কোটি পূর্ব বাংলার মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার তাদের আশ্রয় ও সেবার জন্য এগিয়ে এলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সমর্থনে সারা বিশ্বে প্রচার শুরু করলেন। পাকিস্থানী সরকার ভারতের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার করতে লাগলো। তারা ভারত সীমান্তগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে ভারত যাতে যুদ্ধ বাধায় সেজন্য চেষ্টা করতেও লাগলো। উদ্দেশ্য ভারত যুদ্ধ বাধালে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানের সাহায্যে ছুটে আসবে এবং তখন তাদের সাহায্যে পূর্ব বাংলায় অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে। কিন্তু ভারত যুদ্ধ বাধালো না; তাই শেষ পর্যন্ত পাকিস্থানই ১৯৭১ সালের ২রা ডিসেম্বর রাত্রিতে ভারত আক্রমণ করলো। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে

গেল। পাকিস্থানের বন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দুর্ধর্ষ সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরে এনে ভারতকে ভয় দেখালো। চীন আক্রমণের হুমকি দিলো। কিন্তু ভারত তাতে ভ্রূক্ষেপ করলো না। ভারতীয় বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে দ্রুত অগ্রসর হ'তে লাগলো। ১৬ই ডিসেম্বর প্রতিরোধ অসম্ভব বুঝে নব্বই হাজার পাকিস্থানী সৈন্য ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলো। পাকিস্থান সন্ধি করতে বাধ্য হ'লো।



ইন্দিরা গান্ধী

মুজিবর রহমানকে বন্দী ক'রে পশ্চিম পাকিস্থানে রাখা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলির চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি দেওয়া হ'লো। **বাংলাদেশ** স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বিশ্বে স্বীকৃতি পেলো।

অনুশীলনী

১। পাকিস্থান সম্পর্কে পূর্ব বাংলার মোহভঙ্গের বিবরণ দাও।
২। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যা জান লিখ।
৩। ১৯৭০-এর নির্বাচন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার আন্দোলনের বিবরণ দাও।
৪। পূর্ব বাংলায় নির্বাচন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ দাও।
৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতের অবদান কি?
৬। শেখ মুজিবর রহমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

কালরেখা

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ—	পলাশির যুদ্ধ
১৭৬৫ " —	ইংরেজদের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ
১৭৭২ " —	ইংরেজদের স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ
১৭৯৩ " —	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন
১৮১৭ " —	হিন্দু স্কুল (কলেজ) স্থাপন
১৮৮৫ " —	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
১৯০৫ " —	বঙ্গভঙ্গ
১৯২১-২২ " —	অসহযোগ আন্দোলন
১৯৩০-৩৪ " —	আইন অমান্য আন্দোলন
১৯৩৫ " —	ভারত শাসন আইন প্রবর্ত্তন
১৯৩৭ " —	সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন
১৯৪০ " —	পাকিস্থানের দাবী উত্থাপন
১৯৪২ " —	ভারত ছাড়ো প্রস্তাব ও আগস্ট বিদ্রোহ
১৯৪৭ " —	ভারতের স্বাধীনতা লাভ—পাকিস্থানের উদ্ভব—দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ
১৯৭১ " —	বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব